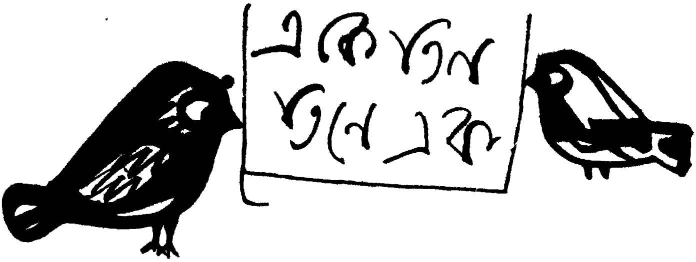


একে তিন তিনে এক

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ; কলিকাতা ১২

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ণ, ১৩৬১
দ্বিতীয় সংস্করণ বৈশাখ, ১৩৬৪

শিল্পী
শ্রীঅজিত গুপ্ত

মুদ্রাকর : শ্রীচন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

সূচীপত্র

একে তিন তিনে এক

ছিরিপদ ছিরিকণ্ঠ ছিরি অভিলাষ
একে তিন তিনে এক ভিন্ ভিন্ গাঁয়ে বাস
গিরি গিল্টি গায় কভু, কভু পিটায় তিন তাস
অভিলাষ বারোমাস যা'তা ফরমায়
ছিরিপদ পদে পদে বাধা জন্মায়
ছিরিকণ্ঠ ধীরিধীরি ঘাড় চুলকায়
দিনটা ভারি বিতিকিচ্ছিরি, ভারি উদাস।

কর্‌করে টিনের ছাত; ঝুপ্‌ঝুপ্‌ বৃষ্টিতে চড়বড় চড়বড় করে খৈ ফুটোতে লেগেছে, রেল আসার দেরী নেই, কয়লা পোড়া ধুঁয়া জলের ভয়ে তিন বন্ধুর সঙ্গ নিয়েছে ইস্টিশানের ছাতের তলে।

ছিরিকণ্ঠ বলে উঠলো, আমরা যাচ্ছি কলকেতায় যাত্রার সাজ কিনতে, নায়েব মশায় ভাড়া দিয়েছে; কাল এমনি সময় ফিরবো গাঁয়ে জানিস অভিলাষ। আমি বলি, আমাকেও নিয়ে চল কখন শহর দেখিনি। ছিরিপদ বলে উঠলো, বটে আমাদের আর অন্য কাজ নেই, তোমায় শহর দেখিয়ে বেড়াতে হবে, ওঁর চাকর বটে আমরা? এই বলেই সে গট্‌গট্ করে এগিয়ে গেল টিকিট ঘরে। আমি ছিরিকণ্ঠের চাদরখানা চেপে বসে থাকি। ছিরিপদ এলেন, হাতে তিনখানা টিকিট। ছিরিকণ্ঠ বল্লে— অভিলাষ, দেখচিস্ কি, চলে আয়। ছিরিপদ বলে, বাঃ দুখানা টিকিটে দুজন মানুষ আর একখানা টিকিট নারদের দাড়ি গোঁপ, রাজার পালকের টুপি, সখীদের পরচুলো সাজ সরঞ্জামগুলোর জন্যে

রাখতে হবে না ? ছিরিকণ্ঠ আমার গা টিপে বলে— রেল আসছে তৈরী থাক, টপ্ করে উঠে পড়িস্ আর কথা নয় গাড়ি এলো বলে ; একবার বাজারের দিক থেকে খোল কর্ত্তাল কের্ত্তনের গোলমাল কানে এল তারপর আর দেখবো কি ঃ— খানিক ধুঁয়া কয়লার গুঁড়ো আর শার্সি খড়খড়ি আর এক দাঁড়ি দু দাঁড়ি তিন দাঁড়ি, সবুজ সাদা লালের ঝাড় নাকের উপর দিয়ে হুহু করে বেরিয়ে গেল নানা রকম শব্দ দিয়ে--

টুইঙ্কল্ টুইঙ্কল্ লিটিলেস্টার, হাব্বাই ভাণ্ডার হাণ্ডিউয়ার !
আফ্তে বাফ্তে আফ্তে বাফ্তে আফ্তে বাফ্তে !
বেরি ফাস্ট সোলো ডাউন বেরি ফাস্ট সোলো ডাউন !
নোস্টপ ইঞ্জিল নোস্টপ ইঞ্জিল ; খাস্ গেলাস্ খাস্ গেলাস ;
ইস্ক্রিম্ সোডা ইস্ক্রিম্ সোডা ; ফুলস্কেপ্ ডাবল ক্রাউন,
ইউড্যাম্ ফুল থ্যাঙ্কু, থ্যাঙ্কু, গেটাউট্ গেটাউট্ গেটাউট্ !

শব্দের আর বাতাসের চোটে গা যেন টলিয়ে দিয়ে গেল—কি গেল এটা ভাই ? ছিরিকণ্ঠ বল্লে—তুফান মেল। আমার তখন গা ঘুরতে লেগেছে— একটা খোঁটা ধরে বসে পড়লেম। একটা ঠেলা গাড়িতে কাচের বাক্সো, তাতে সোডা লেমনেড লাল জল, নীল জল, পুরি, মোহনভোগ, খাজা সবই আছে, সেটা ঝন্ ঝন্ করে এসে থামলো কাটগড়ার কাছে। খানিক পরেই গাড়ির শব্দ— বড়দাড়ুলু চাড়লু নাইডু, বড়দারুলু চারলু নাইডু, গড়ুদারুলু গুড়ুদারুলু—ছিরিকণ্ঠ বল্লে মান্দ্রাজী মেল ছাড়লো। তারপর অনেকক্ষণ গাড়ি আর আসে না ! ছিরিপদ হঠাৎ আধখানা আলুর দম মুখে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—এবার স্বদেশী রেল কোম্পানীর গাড়ি এল—গাবগুবাগুব্, গাবুর গুবুর, গব্ গব্ গব্, আমৃতা, জামতা, ঘুঘু-মেতি স্যাঃ— বলেই যেন ভিজে মাটিতে ছুঁচোবাজির মতো ফুস্ করেই নিভলো।

ছিরিকণ্ঠ গা-ঝাড়া দিয়ে বল্লে— আমাদের গাড়ি আসছে, দেখিস তাড়াতাড়ি উঠতে যাসনে, অনেকক্ষণ দাঁড়ায় গাড়ি, ভীড় আসছে, দেখিস হারিয়ে যাসনে। আমি দুহাতে ছিরিকণ্ঠর চাদর মুঠিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছি— ইস্টিশন-মাস্টার-বাবু আর টিকিট-বাবুতে চেঁচামেচি সুরু করলেন—



ও লাহরী মশয়, খেহেন ঢাহা ইস্পেশ্যাল আইচেন— মেরজাছাহেবের পর্দ্দালসীন্ গারিখানা সাইডিং-এ ঠিক থাহে যেন —ভায়া পরেটাবাদ, রৌগনপুর, বাগুনঝুরি, কৈডিম্বা, মিছিলবারি, নাস্তাবাগ, সকরিহাটা, খাসিরচর। ও কলকুটর। প্যাসেঞ্জারদের ওহানে হাজির থাহ, ওহে বরকতউল্লা! ও বাগে ঘ্যারান ছেও জলদী কৈর‍্যা— ঘুণ্টিবিবি ওৎরাবেন কনে? মাস্টর-মশয়, মেরজাছাহেব তলব ফরমাইচেন,—এই আসি।

দেখতে দেখতে লোকে লোকে টুপিতে চাপকানে খাটো ইজারে আতরের গন্ধে দাড়িতে-দাড়িতে ছয়লাপ চারিদিক— ইস্টেশন বোঝাই হয়ে গেল—আবদাড়ি চাপদাড়ি বুলবুল চস্‌মেদার দাড়ি— তরো বেতরো ইতরদাঁ চিনিকাবাব কালিমির্চ। এমন

সময়— খানাজাদ্ কলাপাত করতে করতে গাড়ি এসে থামলো, লোকের ঠেলা আর বক্‌বকানি—ও উইঠ্যে আসেন, পানবিরাটা তুইল্যা ধরেন, গুল্‌গুলা চুলবুলায় দেহ, মুনসীছাহেব জলদী কুল্লি করেন, গারি আইচেন।— ও ছারল বলি! ল্যেন বদনা, ও মাস্টর সবুর করেন, মেরজাছাহেব খাতি বইচেন। মিরজাসাহেব ধীরে সুস্থে রুমালে মুখ মুছে গাড়িতে উঠলে গাড়ি ছাড়লো আমাদের নিয়ে সোজা দক্ষিণ-মুখো—নিস্‌পিস্ গদাই লস্কর বলে এক ধাক্কা দিয়ে নেচে চল্লো গাড়ি—গজল্ ফজল্ গজল্ ফজল্, তেরে কিটি তাক্, খাস্তা খাস্তা গোস্ত গোস্ত, বোরখা বোরখা খেজাব খেজাব, শীরমল তম্বাখু—একবার সিটি মারলে তারপর আবার চল্লো—সিয়াকলম্ সিয়াকলম্ আবার পোঁ, আবার চলা—গুলেস্তাঁ গুলেস্তাঁ দপ্তরী দপ্তরী শেষে—বিবিজান্ বিবিজান্ বলতে-বলতে সোজা দৌড়—শেয়ালদায় হাজির ভোর পাঁচটাতে।

তখন বেঞ্চের উপরে চাদরমুড়ি দিয়ে মড়ার মতো পড়ে আছি—ঘুমিয়ে না জেগে কিছুই ঠিক নেই! গা দুলছে মন বলছে—ওই দেখা যায় বরানগর সামনে কাশীপুর—কলকেতা কদ্দুর!

একখান রাঙামুখ একটা আলো হাতে ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি দিয়ে একদিকে চলে গেল, তারপরে শুনছি—ও মিসিরজী দেখনা খোঁচা দেকে?—নেহি বাবু মুর্দ্দা হ্যায়, খুঁচাবে তো ফেসাদ হোবে, ভূত হইয়ে গর্দ্দান মট্‌কিয়ে লেবে! আরে না গো, বোধ হচ্ছে মাতোয়ালা, দেখইনা খুঁচিয়ে!—নেহি বাবু, কোন্ জাতের মুর্দ্দা, রাত রইয়েছে ছুঁলে গঙ্গাচান!—এ তো ভারি ফেসাদে ফেল্লে, সাহেব ব্যাটা বলে নামিয়ে নিতে, তুমি বোলতা নেহি বাবু, কি করি এখন? বাবুজী পুলিশ ডেকে ল্যেন, ঝোলাসে উৎরে লেবে!—তারপর পুলিশ-ঘর করি আর কি, চলে এসো

থাকগে পড়ে যেখানকার মড়া সেখানে, আমার কি, না হয় চাকরিই যাবে, বামুনের ছেলে ভাত রেঁধে খাবো। এই সময় শুনলেম, অভিলাষ অভিলাষ— বলে ছিরিকণ্ঠ ডাক পাড়তে পাড়তে দৌড়ে আসছে।

স্বপন দেখেছিস নাকি? বলে ছিরিকণ্ঠ আর ছিরিপদ দুজনে আমার দুহাত ধরে টেনে গাড়ি থেকে নামিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে চল্লো একধারে। আমি ঘাড় চুলকোতে গিয়ে দেখি আমার গলার মটর-মালা নেই। ছিরিকণ্ঠকে বল্লেম, আমার মটর-মালা?

ছিরিপদ খেঁকিয়ে উঠল, নে ঐ দেখ সারি সারি মটর-মালা। ভাল লোককে সাথে এনেছি। দেখিস্, পায়ের দিকে চেয়ে চল। আমি তখন উপর দিকে চেয়ে চলেছি। আকাশ নেই, কেবল টিনের ছাত, তা থেকে চন্দরসূয্যির মত সারি সারি আলো ঝুলছে। পায়ের দিকে চেয়ে দেখি শান বাঁধানো। খানিক চলে আকাশ পেলেম। রাস্তায় পড়ে দেখি বোড়া সাপের মত লম্বা লম্বা কি পড়ে আছে দুটো। ছিরিপদ বল্লে, এই দাগ ধরে চলো সোজা বাসায়। ছিরিকণ্ঠ বল্ল, সরে আয়, ও দিকে যাস্‌নি, মটর-চাপা পড়বি। না জানি কত বড় মটরই হয় কলকাতায়! ভাবতে ভাবতে চলেছি, ছিরিপদ ডেকে বল্লে, এই বাস্ স্টপ্।

অমনি একটা দোতলা ঘর এসে সামনে দাঁড়াতেই ছিরিপদ আমাকে বাড়িতে তুলে দিয়ে বল্লে, তোরা বাসায় যা, আমি মার্কেট ঘুরে আসছি। বাড়িটা যেন উড়ে চল্লো ভোঁ ভোঁ শব্দ দিতে দিতে। তারপর এ মোড় সে মোড় ঘুরে খালধারে আমাদের দুজনকে নামিয়ে দিয়ে শোঁ শোঁ বেরিয়ে চলে গেল।

শহরটা তো দেখা বস্তু—এর আর কি বর্ণনা দেব। ছাঁদ-বাঁধ খুব কিন্তু ছিরি মোটেই নেই। বাঁধা রোশনাই, বাঁধা দিঘি, বাঁধা

রাস্তা, বাঁধা দস্তুর, ধুলো কাদা মশা মাছি সবই। বাড়িগুলো বেশীর ভাগই মেড়ো ফ্যাশান—এক এক ফালি আকাশে উঠেছে। দোকানে চা বাঁধা দর। জল—মিঠে সাদা,—যেমন চাই বাঁধা দর।

বাঁধা বাঁধা বাঁধা
লাগে ভেলকি ধাঁধা

দেখি না ছেলেগুলো সমুদ্দুর পার হতে শিখবে, তাই মাস্টার বাঁধা পুকুরে তাদের ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু মেঘনা পদ্মা গঙ্গা থাকতে বাঁধা গোলদিঘিতে চরাতে এলো কেন এরা ছেলেদের—ছিরিকণ্ঠ এই কথা একজনকে শুধোতে সে চশমার মধ্যে দিয়ে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে বলে, একে বলে বিলাতি সুইমিঙ্ক আর তাকে বলে পাড়াগেঁয়ে সাঁতার। ছিরিকণ্ঠ ছিল সঙ্গে তাই রক্ষে, ছিরিপদ থাকলে মাস্টারকে দেখিয়ে দিত সাঁতার কাকে বলে। ছিরিকণ্ঠ খালি গেয়ে উঠল—

দেখ ভাই আজব কারখানা—
যেন শোলার পুতুল জলে ভাসে ডোবালেও মন ডোবে না।
হালকা ও সে এমনি ভাসে,
যেন ডোবায় ধরা টোপাপানা।
ও সে ভেসেই রল।

লোক জমা হয়ে গেল দেখে আমরা সরে পড়লুম। ছিরিকণ্ঠ বল্লে, চল্‌ পিকেটিং দেখে আসি।

—সে আবার কি?

—এই যেমন সুইমিং তেমনি পিকেটিং।

এই সময়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখি, যাঃ পকেট মেরেছে। একেবারে সব বিড়িকটা পকেটিং করেছে রে, কাজ নেই আর পিকেটিং দেখে, চল, বাসায়।

বাসাতে এসে দেখি ছিরিপদ ফিরেছে বাজার করে। ছিরিপদর জিম্মেতে আমাকে রেখে ছিরিকণ্ঠ বেরিয়ে গেল। ছিরিপদ বল্লে, বোস, ফর্দ্দ মেলাই। খাতাঞ্চি মশাই পাঁজি ধরে ফর্দ্দ টেনেছে, একটি জিনিস এ দিক ও দিক হলে ধুন্ধুমার বাধিয়ে দেবে। আমি ফর্দ্দ পড়ে চল্লেম, ছিরিপদ মেলাতে বসল।

যাত্রার ফর্দ্দ

মেছুয়াদের মৎস্য ধরিবার জন্য।

বিলাতি হুইল এক নম্বর। ঐ আনা টম্‌সনের বঁড়শি। সুইভেল ও ফাৎনা ১০০।

বাবুদের জন্য।

বিলাতি কলার দুই বাক্স। বিলাতি আল্ হুক এক ডজন। অ্যাংকেল গাড্ মজ্‌বুদ বিলাতি চামড়ার ২ সেট। ঐ লি ক্যাপ অ্যাংকেলেট কটন সিল্কের ২ সেট।

খেলাধুলার জন্য।

কুকুর ডাকিবার জন্য রেফারী হুউসিল। বিলাতি ইনডোর গেম ১ বাক্স। পান মসলা। চেসমেন। ইণ্ডোডালসিস্। অম্বলিন

শখের দলের রন্ধনের জন্য।

পিপার বা লঙ্কা। চিনি রাক্ষুসি। বিস্টের প্রকাণ্ড জয়েন্ট। ডিম্ব মুলা (মুরগীর নয় হাঁসের)। অক্স হার্ট ক্যারট। কাউ হরণ ছালাদ। গম আরবী। অর্জ্জুন তৈল। অভয়া লবণ। মধ্যম নারান তৈল ও অশ্বগন্ধ ঘৃত (বাজে লোকদের জন্য)। ব্রাহ্মী ঘৃত, মরিচাদি তৈল, নিম্বাদি রস, ইচ্ছাভেদী বঁটি, চা, রুটি, ২ ডজন বড় টিন (বাবুদের আহারের জন্য)

যাত্রার সাজগোজ।

মুখোছ্রী ২৫ কৌটা। ক্যানেডিয়ান স্বর্ণের ইস্পিরিং চুড়ি

বা হাত কড়া ৪ জোড়া। গুলবাহার শাড়ি। তরল আলতা। হলো গ্রাউণ্ড ক্ষুর। জার্ম্মান ক্রেপ। আনা সেবিং ব্রাস। ভিনোলিয়া কলগেট। কেশরঞ্জন ইত্যাদি (সখীদিগের জন্য), ২টা টর্চ্চ লাইট, ফিটিং বাক্স ১টা, বটকেষ্টপালের তাম্বু ১টা, বাইশিকল্ ১গাছা, সাজাহান ১খানা, মোগল বংশ ৭খানা, যাত্রা পাঁচালির বই খান কয়েক। রেকর্ড খাতা ছোট বড় ৫ খানা। শৌখিন পাক দড়ি ১৪ গজ। ঐ সিল্কের মায়ার বাঁধন ২০ গজ। ভুতনাথ খান্নার সচিত্র চিঠির খাম ও কাগজ ১০০। রাজ হাঁস ১ জোড়া।

আমি বল্লেম, রাজ হাঁস নিয়ে কি হবে ?

ছিরিপদ বল্লে, ওটা খাতাঞ্চি মশায়ের ফরমাস। রোজ কলম কিনতে পয়সা লাগে ; দুটো হাঁস হলে ডিমও খাওয়া যাবে, কলমও পাওয়া যাবে, মহারাজার টুপিতে গোঁজাও চলবে।

আমি বলি, হাঁসকে খাওয়াতে বুঝি খরচ নেই।

ছিরিপদ বল্লে, চরে চরে খাবে কাদা গুগলি। যদি শেয়ালের পেটেই যায় পালকগুলো তো পাওয়া যাবে।

ফর্দ্দ মেলানো হচ্ছে এমন সময় গাইতে গাইতে ছিরিকণ্ঠ প্রবেশ করল।

(গান)

কার হিসাব লিখছিস বসে মনের খোশে,
আপন কাজ মুলতুব রেখে ?
তোর চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে,
পরের চোখে দেখছিস চোখে।
লিখছিস পরের বাকি জায়,
আপনার দিন যায় তোর ঠিকানা নাই সে দিকে।

—কি রে ছিরিপদ, থিয়েটারে গেছিলি নাকি ?

—আরে না অবনীবাবুর ওখান থেকে আসছি। খাতাঞ্চি মশায়ের চিঠির জবাবে এই গানটা দিলে, তাই মুখস্থ করে নিচ্ছি।

—বাবু বুঝি চিঠির জবাবটা লিখে দিতে পারলেন না ?

—না, বল্লে মুখে মুখে জবাব নিয়ে যাও; এখন আমি ছবি লিখতে ব্যস্ত আছি।

— তুই গেছলি ঠাকুর বাড়িতে, কেউ রুখলে না ?

—না সোজা চলে গেলাম।

— তারপর ?

— তারপর শুনলেম ঠাকুর গেছলেন একটু আগে বোগদাদে, এখনই ফিরলেন।

—গেল আর ফিরল ? বোগদাদ কি এখানে যে—

—আরে শোন না, ঐ কথাই আমি একজন ঠাকুরদাসকে শুধোতে সে বল্লে, আজ কাল ঠাকুর মশাইকে হাজার দাস্তাঁর ছবির জন্যে রোজ রোজ দৌড়তে হয় ইরান, তুরান, বাসরা, বোগদাদ। খালি ঘুমোতে আর খেতে আসেন বাড়ি দিনে দু তিন বার।

—বলিস কি অ্যাঁ ?

—বলি শোন না, আমাকে তো ঠাকুরদাস তার নিজের ঘরে বসিয়ে বল্লে, পান খান। বিড়ি কি সিগারেটের নামও করলে না। বসে আছি, দেখি একটা বর্ম্মা এনে দিলে। এতক্ষণ চেয়ে দেখছিলেম বৈঠকখানা বাড়ি পুরোনো ঝরঝরে ভাঙা চোরা। যেমন বর্ম্মা ধরিয়ে একটান দিয়েছি টেক্কামার্কা জ্বেলে অমনি সব বদলে গেল। ছেঁড়া মাদুর হয়ে গেল মখ্‌মলের গালচে। ঘরটা একেবারে শিস্‌মহল বাদশাই কেতার। আবু হোসেনের

মত হক্‌হকিয়ে গেলুম। ঠাকুরদাস তখন আর দাস নেই, একেবারে খাসমহলের বান্দা হয়ে গেছে, ঠিক যেন রঙের গোলামটা। হুবহু নবাবী কেতার। সেলাম করে বল্লে, চলিয়ে, হুজুর তলব ফরমাতে হেঁ। তাড়াতাড়ি চুরোট ফেলে উঠতেই দেখি যা ছিল আগে তাই— সেই পুরোনো বাড়ি ঘর। দক্ষিণের বারান্দার একটা ছেঁড়া চেয়ারে বসে অবনী ঠাকুরঃ— বুক খোলা জামা, পরনে লুঙি, মাথায় টাক, চোখে হরিণের শিঙের চশমা। বোসো— বলেই তিনি হাঁকলেন— রাধু তামাক দে। একটা পিতলের গড়গড়া, তাতে খানিক রবার খানিক বাঁশ খানিক দস্তা খানিক সিলভারের নল। সেইটে টানতে টানতে তিনি বল্লেন, আসছ কোত্থেকে? আমি বল্লুম, খাতাঞ্চি মশাই পত্তর দিয়েছেন। তিনি বল্লেন, খাতাঞ্চি মশায়ের লোক তাই বল। পত্র রইল, জবাব পরে দেব, এখন বলত তিনি কেমন আছেন? সোনাতোনের সেই বোহিম কুকুরটা? আমি একটা কুকুর পেয়েছি হে, নাম ভালু। রোসো, তা হলে কি কাজ আছে শুনি। আমি বল্লুম, আজ্ঞে যাত্রা হবে; তাই কেমন সিন্, কেমন সাজ হবে তারই একটু উপদেশ চাই।— ওঃ বলেই তিনি খানিক তামাক টানতে থাকলেন, তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন— দেখ তোমার সিন্ কি ড্রেস কি কিচ্ছু দরকার নেই। বাপু ছেলেরা যে খেলা করে তারা কি সিন্ চায় না ড্রেস? একটা কাঠকে করলে ঘোড়া, সওয়ার হয়ে চল্লো টগ্‌বগ্। তুলে দাও সিন্ ফিন্। সাদা কাগজে লিখলেম, আরব কি বোগদাদ; বাদশা কি বেগম, অমনি তো তারা চোখের সামনে এল, মুখ্যু যারা দেখতে শেখেনি তাদের জন্যেই সাজতে হয় এটা ওটা সেটা, আঁকতেও হয় সিন্— নদী পাহাড় পুকুর। আরে বাপু এই তো দেখছ বসে

আছি ভালমানুষটি, একটু বুক ফুলিয়ে জোরে কথা বলি, ভাববে ভীম এলো— ভয়ে দৌড় মারবে। একটু সাজ চাই; রাজা হলে দিলেম একটা পালক গোঁজা টুপি মাথায় চাপিয়ে। কোতোয়াল হলে বেঁধে নিলে লাল সালুর পাগড়ি— ভয়ে থতমত হল লোক। কোতোয়ালের পাগড়ির নালটুকু ছেঁটে দাও, হয়ে যাবে সে মোটা পেট নিরীহ ভালমানুষটি। ময়ূরের ল্যাজ কেটে নাও, রানী হল যেন মেথরানী। বুঝলে তো? এই বুঝে সাজ কিনো। কতকগুলো জবড়জং ব্যাপারে পয়সা নষ্ট কোরো না। কথাগুলো ভাল করে বলতে পারলেই যাত্রার আসর মাৎ। বুঝলে? যাও এখন— রোসো জবাব নিয়ে যাও—বলেই চিঠি খানায় চোখ বুলিয়েই গানটা আওড়ে দিলেন।—তারপরই হো হো করে হেসে বল্লেন, মুখে মুখেই মুখের মত জবাব, দেখো ভুলে যেও না, নমস্কার।

নমস্কার করে উঠতে যাবো,— দাঁড়াও— বলে অবনীবাবু ডাকলেন—রাধু! বাবুকে মস্কট্ থেকে যে খেজুর এনেছি আর বোগদাদ থেকে যে বেদানা পেয়েছি আর বসরার গোলাপ ফুলের তোড়া এনে দাও।

রাধু জিনিসগুলো আনতে ছুটলো। অবনীবাবু বল্লেন— বোসো না, একটা মজার কথা শোনো। আজ হঠাৎ ডাক পড়লো হারুন-অল-রসিদের ওখানে। কি হল, না বাদশার গলায় মাছের কাঁটা ফুটেছে। দৌড়লেম, গিয়ে দেখি হাকিমে হাকিমে গিজ্ গিজ্ করছে ঘর। বাদশা শুয়ে আছেন। আমি বল্লেম, দেখি একবার হাঁ করেন তো। হাঁ করলেন, একটা বাঘ যেন মুখ ব্যাদান করলে। ছবি আঁকবো দেখো। হাঁ দেখেই আমার কথামালার গল্প মনে এলো—একদা এক বাঘের গলায়

হাড় ফুটিয়াছিল। আমি অমনি নিজেকে মনে করলাম বক। আর সোজা আঙুল চালিয়ে দিলেম শোল্লার মত বাদশার গলায়। হাড় নির্গত, তারপর বকশিশ খেল্লাৎ। লম্বা আঙুলের কত গুণ দেখেছ? রাধু কিস্‌মিস্‌ বাদাম পেস্তা সেই সঙ্গে মস্কটি হালুয়া ইত্যাদি নিয়ে হাজির হল—বিদায়, বিদায়।

আমি, অভিলাষ বলে উঠলেম, কই কই সে সব?

—আরে সে কি আছে? কতক খেয়েছি আমি, কতক খেয়েছে রাধু, কতক বাড়ির ছেলেপিলে, কতক বা রাস্তার লোক।

—ধ্যাৎ, বলে ছিরিপদ ছেঁড়া মাদুরে হাত পা ছড়িয়ে চিৎপাৎ হয়ে পড়ল। খানিক বাদে ধড়মড়িয়ে দাঁড়িয়ে বল্লে—চল্লুম।

—কোথায় রে?

—কাজ আছে। বলেই ছিরিপদ দ্রুতপদে অন্তর্দ্ধান।

ছিরিকণ্ঠ হেসে বল্লে—গেলেন অবনীবাবুর ওখানে।—এখন তাঁর ঘুমের সময়, কারু হুকুম নেই জাগাবার। চল আমরা ততক্ষণ বাজারে উড়ে যাত্রা দেখে আসি।

খালধারে মাঠকোঠা—তারি দোতালায় বাক্স ভাঙা তক্তা, তারি চার কোণে চার খোঁটার উপরে পুরোনো ক্যানেস্ত্রার টিন দিয়ে ছাওয়া ছাদ। দেয়াল নেই, ছেঁড়া চটের পর্দ্দা। আর ঘুণ ধরা বাঁশের চাটাই দরমা এই সবের বেড়া। দরজা এক পাল্লা ছিল এক কালে, এখন কেবল কুলুপ দেবার শিকলটা ঝুলে আছে। আসতে যেতে মাথায় ঠং করে লাগে। এই ঘরে নিয়েছি বাসা, তিন চারে বারো আনা রোজ লাগে। নীচে থাকে দোকানী। দুখান মুড়ির চাকতি আর কলঙ্ক ধরা পিতলের ঘটির আধ ঘটি জল এই দিয়ে তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে ভিজে গামছা মাথায়

বেরিয়ে পড়লেম দুজনে বাজারের দিকে। সেটা বাগবাজার স’ বাজার নতুন বাজার গোছের একটা বাজার। একটা শাটের খালি আড়ত। তারি মধ্যে বসেছে যাত্রা। ঢোল বাজছে না, একটা উড়ে একটা টিনের গামলা পেটাচ্ছে—টুক্কুরু টুক্কুরু। আর একটা উড়ে গোঁসাই গোছের ফোঁটা কেটে গৌরচন্দ্রিকা সুরু করেছে—

আরে মধু মাসরে গুবাকু ফুঁকি,
তেরে কিটি ধাঁই করি বৈঠকি।
তরো বেতরো তাকিয়া হেলানে
মহা মজলিস বসিলা এহানে।
রসিক মিলিল গণ্ডা গণ্ডা,
রঙ্গে ঢঙ্গে বিবিধ পণ্ডা।
রসনা রোচক খণ্ডার বাণী
আসর জমক ঠণ্ডা পানী।
সরস কথা মনস হরা
পান বিরা আর ধুম পতরা।

সবাই অমনি ফস্ ফস্ বিড়ি ধরিয়ে নিলে। দেখি এক ছোকরা মাথায় হাল ফ্যাশানে টেরি কাটা, যেন এক বাণ্ডিল হলো-গ্রাউণ্ড ক্ষুরকে সাজিয়ে রেখেছে পাশাপাশি খাড়া করে। দুই কানের উপর থেকে ঘাড় কামানো। এক ঝুড়ি পান আর প্রোগ্রাম হাতে হাতে বিলি করে গেল।

প্রোগ্রামটা পড়ে নিলেম ঃ—

অবনীন্দ্রবাবুর স্বহস্তে ওঠানো ১০১ রজনীব্যাপী সর্ব্বজন-আদরিত ছিলিম।

হঠাৎ এই সময় হারমনি বাজা বাজিয়ে ভদ্রলোক স্বদেশী গান গাইতে গাইতে চাঁদা আদায় করতে এসে গেল। যেমন তার

গান আরম্ভ করা অমনি যেন ভেড়ার গোয়ালে কে আগুন ধরিয়ে দিলে। চাঁদা দেবার ভয়ে আমরাও যে যার উঠে চম্পট। কে বা কার গান শোনে।

বাসায় এসে ছিরিকণ্ঠ বল্লে —কেমন দেখলি ফিলিম।

—আর রাখ তোর ছিলিম। চোখ এখনও টন্‌টন্ করছে। কান করছে ভোঁ ভোঁ মাথা ঘুরছে বোঁ বোঁ।

ছিরিকণ্ঠ বল্লে—ছিলিম কি রে বল ফিলিম। নতুন বায়স্কোপ ভাল লাগল না?

আমি বল্লুম—এই দেখ কাগজে লিখেছে সর্ব্বজন-আদরিত ছিলিম।

—ওরে ছাপার ভুল রে, এরা ভিতর ছাপতে ছাপে ভেতর, উপর ছাপতে ছাপে ওপর, নাথ কে ছাপে লাথ, প্রলয়কে ছাপে প্রণয়।



এই সময় ছিরিপদ রোদে ধুলোয় তেতে পুড়ে হাজির। মুখে একটা মোটা চুরুট। —ছিরিকণ্ঠ তাকে দেখেই বলে উঠল— দেখা হল অবনীবাবুর সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

—চুরুট পেলি কোথা

—কেন, রাধু দিলে।

—তারপর ?

—তারপর প্রথম মহলে দেখলেম মুন্সী মীর বক্সী আর বড় বড় পীর মর্দ্দ, পাইক, ঢালী, আরদালী, লস্কর, চোপদার, আছাব, মহছাব, জমাদ্দার, পেশকার, উজির, নাজির আর বীরবল, কোতোয়াল সব একেবারে খাড়া হাজির—আদবে হইয়া খাড়া রয়েছে সকলে। তার পর দ্বিতীয় মহলে দেখি—সব নজ্জুম তারা গণনা স্বরু করেছে—

মেরিক মস্তরি কর অদারত তারা
কোমর জোহরা জোহেল এ সাত ছেতরা।

তারপর তৃতীয় মহলে দেখি সব আপসরিগণ নৃত্যগীত করছে—

ছেতরা বাজায় কেহ তম্বুরা মৃদঙ্গ
তবলা বেহালা বাজে মন্দিরা মোরচঙ্গ।
হারমনি বাজা কেহ বাজায় বসিয়া
তালে তালে নাচে গায় ঘাড় হেলাইয়া।

চতুর্থ মহলে দেখলেম গোলবাগ জহরুত পাথরে বাঁধা রাস্তা, ফুল চানকা ফোঁহারা, তার মধ্যে তেলেছমাতের বাগান পাহাড় পর্ব্বত কেল্লা। সেখানে ভাই জানিস—

আন্ধা নামে বৃক্ষ এক বড় ছায়াদার
ঝোলে ডালে ডালে ফল যেমন আনার।

সে ফল খেলে কি হয় জানিস ?

—না বল না শুনি, তুই খেয়েছিস নাকি ?

—ভাই গিয়েছিলেম খেতে, মালি হাত চেপে ধরলে। তার মুখে জানলেম—

যদি কোন রকমেতে সেই ফল খায়
ঘুরিবে আন্ধেলা হয়ে বাগানে সদাই।

বাস্ রে কি বাগানই বানিয়েছে

নাহিক জমিনে বাগ নাহিক আছমানে
বানাইল গোলবাগ সেই তো কামিনে—
যাদুতে প্রাচীর চার নির্ম্মাণ করিল
নানা জাতি বৃক্ষ ফল যাদুতে গড়িল।

বাবা বসন্ত বাহার ফুল, শহরে কেন ভারতবর্ষে কোথাও নেই সেখানে দেখলেম ফুট আছে। সেই ফুল গাছের তলায়।

মূর্ত্তি এক দেখি সেথা অতি বদহাল
কুঁজ পিঠ মোটা নাক শুকনা কঙ্কাল।

পঞ্চম মহলে তোপখানা। সেখানে দেখি সব লোহাচুর আর বারুদ নিয়ে বাজিগরেরা তুবড়ি গড়ছে আরও কত কি বাজি। ষষ্ঠ মহলে দেখি যত পালোয়ান আর কুস্তিগীর।

পালোয়ান পীল নস্ত ছাহেব সর্দ্দার
ধুতি এক পরিয়াছে আশি গজ
মস্তকে ধরিয়াছে দেড় মনি তাজ
তিরিশ মনের এক জিঞ্জির কোমরে বাঁধিয়া,
দু হাজার মনের গোর্জ্জ বগলে দাবিয়া,
বিশ মন ঢাল পিঠে আগেন বসিয়া,
উনিশ মনের এক তলোয়ার লইয়া

আমি কাছে যেতেই পালোয়ান গোলামকে বল্লে—হুক্কা লাও। যেন ভাই হাতী ডাকল। তারপর ভাই, এক হুক্কা এল তার ছিলুমে পাঁচ মন তামাক ধরে, তিন মন টিকে ধরাতে লাগে সে তামাক। তার নলচেতে একটা দু মন নল লাগানো। সে তামাকে টান দিলে শিব পড়ে ঢলে! সপ্তম মহলে দেখি

হাবসীনীর পাহারা। কালো পাথরের ফটক আগলে বসে আছে বলব কি ভাই দেখেই ভয় লাগে।



গোঁফ তার শকুনির দন্ত শূকরের—
চুল তার ঘাড় ছাঁটা যেন কুকুরের।

সাত মহলা পার হতেই সাত পহর কেটে গেল। সেখানে পেট ভরে খেয়ে নিলেম।

শির বিরিঞ্জি ফালুদা আর গোলাপী সরবৎ,
কালিয়া কোর্মা কোফ্‌তা কাবাব দল্লকৎ।
আখরোটি মনাক্কা কিসমিস বাদাম,
খোরমা ও খেজুর কত ভাল ভাল আম।
শিরা ও মালাই ফিরণী চৌরসের দুধ,
চিনি মিছরি নিয়ামত খাইনু বহুৎ।

তারপর পানি খাইয়া পান মুখে দিয়া
শয়ন মহলে শেষে পৌঁছিনু যাইয়া।
সেখানে ভাই পশুপক্ষী নাহি পারে যাইতে উড়িয়া।

সেখানে দেখি না কালপরী আর নিদ্রাপরী পাহারা দিচ্ছে দুজনে ফটকের দুইধারে বসে অষ্ট ধাউতের মতন যেমন পাষাণ। আমাকে দেখেই তারা ডেকে বল্লে—

কালো পরী বলে দিদি হুর নুর নয়,
বুঝি কোন সাহাজাদা মোর মনে কয়।

আমি তাদের যেমন বলেছি দুয়ার খোলো আর অমনি মোরগ ব্যঙ্গ দিয়েছে।

নিশি পোহাইয়া গেল কোকিল কাড়ে রাও—
শয্যা হইতে অবনীন্দ্র চৈতন করে গাও।
অজুনামার সারি লিয়া সরাগত হৈল,
ফুলটুঙির ঘরে গিয়া দেওয়ানে বসিল।

সেখানে দেখি ভাই আর কেউ নেই, কেবল ছেলে আর মেয়ে। সেখানে তিনি ছেলেদের সাথে ছাওয়ালের বুক ধরে আছেন খেলিতে।

কাঁধেতে লয়েছে ঝোলা হাতে খেলা আর
চিত্রকরা শাল অঙ্গে দিয়েছে বাহার।

—তারপর?

—তারপর আর কি বসি একাসনে
হাস্য পরিহাস কথা কহি দুইজনে।

—তারপর?

—তারপর গজস্কন্ধে মাহুত আসি ডঙ্কা বাজাইল। আমি সেই হাতীতে চড়ে চলে এলেম।

—আসবার কালে কিছু বল্লে না ?

—হাঁ বল্লে তুমি তো ছিরিপদ নহ দু-পুরিয়া ডাকাত। এর মানে কি ভাই ?

—ওর মানে তোর সবটাই মিথ্যে। দেখি চুরুটটা ? ছোঃ এ যে লারানের দোকানের ছাপ! অবনীবাবু এ চুরুট ছোঁয়ই না ; এ মার্কাই নয়।

—তবে সে কি মার্কা শুনি ?

ছিরিকণ্ঠ খানিক থেমে বল্লে—চিন্তা ফুং মার্কা! চিনের আফুং ক্ষেতের ঠিক গায়েই বর্ম্মাদেশের তামাকের চাষ। সেই-খান থেকে আসে তার চুরুট ; তার নাম চিন্তা ফুং, বুঝেছিস্। তুই ঠকেছিস্। যাঃ বাজে বকিস্ নে আমি দেখিনি নাকি অবনীবাবুকে ?

ছিরিপদ কোন উত্তর দিলে না, খালি বল্লে—বিশ্বাস না করিস্ তো ভাই— বলেই সে চুরুটটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে বল্লে—আর একটা মজা হয়েছিল সেখানে তা আর বলব না।

আমি অমনি বলে উঠলেম্—বল না ভাই।

—আচ্ছা তবে শোন—বলে ছিরিপদ আরম্ভ করলে।

—মনে ছিল সেই সোনারুপোর ঝুলিমোড়া গজহস্তীর পিঠে একেবারে এখানে উপস্থিত হয়ে তোদের অবাক করে দেব, আর ছিরিকণ্ঠের মুখটা কেমন হয় তাও দেখে নেব। কিন্তু ভাই বলব কি গজস্কন্ধে পা দিয়েছি কি না অমনি সে গজহস্তীর মত পালোয়ানটা ফ্যাঁ—চা—ত্ করে এক হাঁচি! আমার সঙ্গে সেই ঠাকুরদাস আসছিল। সেও অমনি একটা টিকটিকির মতো ছোট্ট করে হেঁচে দিলে—গি—চি—গো! বাস! তারপরে সার বন্দী অযাত্রা দেখা দিলে।

মাকড়ের স্থতে হৈল যাইবার পথ বন্ধ ;
গোয়ালার মাথা হতে পড়ে দধি-ভাণ্ড।
শুকনা ডালেতে বসি ডাকে দাঁড়-কাক,
যুগিনী মাণ্ডিয়া লয় কহ আর শাক।
কাঠ লিয়া কাঠুরিয়া আগে আগে যায়—
গঙ্গাতীরে হিন্দুগণ মুর্দ্দা জ্বালায়।

সবই অযাত্রা দেখলেম; স্থযাত্রার মধ্যে কি একটাও নেই।

না দধি লেহ বলি ডাকে গোয়ালিনী
না পুষ্পের পসার লইয়া ভেটেন মালিনী
যাবার কালে ধেনুর বাচ্ছা সামনে না দাঁড়ায়

খালি একটি মাত্র স্থযাত্রা

গজস্কন্ধে মাহুত বসি ডঙ্কাটা বাজায়।

কিন্তু একা মাহুত এক হাতী আর এক ডঙ্কা আর এই ছিরিপদ কত অযাত্রা ঠেকাবে? কেল্লার ফটকের কাছে এসে আট্‌কা পড়লেম। কিলেদার কিল খুল্লেনা দরজার, ফাটক বন্ধ, কি ব্যাপার? না বাবুসাহেবের ছেলে মাণিকের আংটি পাওয়া যাচ্ছে না। ফেরাও হাতী। চলো হুজুরে! দেখি চারিদিকে খানাতল্লাশি পড়ে গেছে। সিন্দুক যার যত ছিল তো ভেঙেই ফেলেছে। ভাল ভাল সব তম্বুরা, তবলা, বেহালা, বাঁশী সেগুলো পর্য্যন্ত ফাটিয়ে দেখছে আংটি পায় কি না। বাবুর খানসামা অনাটন দুই পকেট আর দুই চোখ উলটে আকাশের দিকে চেয়ে আকাশ পাতাল ভাবছে। বৈঠকখানায় গালচেগুলো উলটে ফেলেছে। বড় বড় কোচ কেদারা টেবেল চার পা তুলে মরা গরু ছাগলগুলোর মত পড়ে আছে। বড় বড় বিলিতি আরশি সেগুলো ফাটিয়ে দেখছে আংটি পায় কি না। হাঁড়িকুড়ি বাসন আলমারি সব ছত্রিচ্ছন্ন

করে ছড়িয়ে ফেলে দেখছে আংটি পায় কি না। আমাকে বলে কোতোয়াল পকেট দেখাতে। আমি বলি, দেখ না-আছে কোট না-আছে কামিজ। 'হাঁ কর।' 'হাঁ—নাও পানের পিচ্।' 'চুল ঝাড়ো।' 'নাও উকুন!' 'কাপড় ঝাড়া দাও।' 'নাও ছেঁড়া কোপনি।' শহুরে হলে ভুগতে হত। খানাতল্লাসীর চোটে হয়ত গায়ের মাংসও খানিক লোকসান হত। যাই হোক ভালয় ভালয় অনাটনের কাছে পৌঁছে বল্লেম কাণ্ডখানা কি, একেবারে যে কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছে। সে বল্লে, কে জানে, কোথায় নিজেই ফেলেছে, এখন লোকের উপর জুলুম। আমি কালই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেশে চল্লেম। দরোয়ান বাবুর্চি ডাইভার সবাই পরামর্শ করছে—ভাই এসা মুনিবকা কাম ছোড় দেনা মনাসিব। বাঁদীগুলো এক একটা যেন হিড়িম্বা শূর্পণখা পূতনা কত নাম করব। রেগে ঘোড়া গিটকিরী ছেড়েছে নানা সুরে। হায় হায় ছো ছো ছো হিঁগা হিঁগা হিঁগা। এমন সময় বাবুর পোষা কুকুরটা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে তিনবার কেশেই আংটি উগরে দিলে। 'আরে এ ক্যা হ্যায়' বলে দারোয়ানজী সেটা তুলতে যেতেই অনাটন টপ করে সেটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে বল্লে—'বটে এর জন্যে হাজার আশরফি বকশিশ আছে।' তুমি ভালুকে গেরেফতার কর আমি এটা দিয়ে আসি পৌঁছে। ভালু সে বাবুর কুকুর—গ্রেপ্তার করে কে? সে অনাটনের সঙ্গে দৌড়োলো উপরে। তার পরেই সাক্ষী তলব। আমরা সবাই কুকুরের হয়েই সাক্ষী দিলেম। দারোয়ানজী কেবল বল্লে—'ক্যা জানে হুজুর কাঁহাসে অনাটনে আঙ্গুস্তারা নিকলা।'—ভাবটা যে ওই নিয়েছিল।

যাই হোক ভালুকে পেট ভরে খেতে দেয় না বলে অনাটন

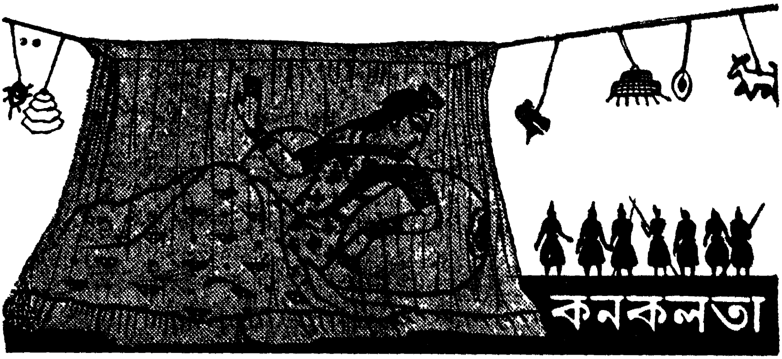
আশরফির সঙ্গে ধমকও খেলে, আর ভালুর জন্যে এক বাটি করে ঘন ক্ষীর বরাদ্দ হয়ে গেল। হুকুম হল, খানসামাকে নিজের হাতে জ্বাল দিয়ে ক্ষীর তৈরী করতে হবে রোজ দেড় পোয়া করে, কুকুর মরে গেলেও। একেবারে নবাবি শাস্তি।

ফেরবার সময় দেখি ইট ভেঙে চুন খসে টালি খুলে খানা-তল্লাশির চোটে অতবড় বাড়িটা যেন ফোগলা হয়ে গেছে। একটু তামাক পর্য্যন্ত খেতে পেলুম না। রাস্তায় পড়ে দেখি নারানের দোকান। সে এক কাপ চায়ের সঙ্গে একটা চুরুট ফাও দিলে। সেইটে ফুঁকতে ফুঁকতে এসে দেখি তোরা—এখন বিশ্বাস করিস্ কি না-করিস্। বলেই সে পাশ ফিরে ঘুম দিলে।

আমি পকেট থেকে এক ঠোঙা অবাক জলপান বার করে চিতপাত হয়ে চিবতে থাকলুম।

ছিরিকণ্ঠ একবার শুধোলে, অবাক জলপান পেলি কোত্থেকে?

আমি হাতে আমার সীসের আংটিটা দেখিয়ে ঘাড় চুলকে বল্লেম, এইটে ঘসতেই এসে গেল। তারপর দুজনের নাসিকা গর্জ্জন আর আমার দাঁত কড়মড়।



কনকলতা

সুন্দর রাজার কালো মন্ত্রী। মন্ত্রীর সাত ছেলে—তারা কালো-বান্দোর, আর এক মেয়ে—সে নিখুঁত সোন্দর। মন্ত্রী মেয়ের নাম দিলেন—কনকলতা। কালো ছেলেদের কারো নাম দিলেন—রামু, কারো সামু, কারো ধামু! যার যেমন মুখ তার তেমনি নাম—যেমন সব কেলে হাঁড়ি আর কেলে হাতা।

মন্ত্রীর কোলে-কোলেই কনকলতা থাকে আর মানুষ হয়, ছেলেগুলো পড়ে থাকে কাদায় ধুলোয় পাঁকে।

কনকলতা দিনেদিনে বাড়ে আর দাদারা তাকে ডাকে—আয় না, মাটিতে নেমে ধুলো খেলবি। কনকলতা নামতে যায়, মন্ত্রী তাকে ধরে পালঙ্কে শুইয়ে দেয় মশারি টেনে দেয়—রুপো-সোনার মিহি জাল! সেখান থেকে দেখা যায় বাইরের খেলা ধুলো কিন্তু বেরিয়ে আসা যায় না কোনো মতেই। কনকলতা খাঁচার পাখীর মতো মশারির মধ্যে বসে কাঁদে আর তার দাদারা ছাড়া-পাখীর মতো মশারির বাইরে বসে ডাকে—আয় আয় খেলি আয়!

এমনি কোরে দিন যায়। কালো হলে কি হয় মন্ত্রীর ছেলে তো বটে; সবার সুন্দর বৌ এসে গেল। মেয়ে রইল আইবুড়ি

গুড়িসুড়ি—সেই মশারির মধ্যে। বাড়ীর ছোট বৌ সে আসে যায় কনকলতার ঘরে, বসে বসে গল্প করে—রাজপুত্তুরের গল্প। কনকলতা বলে—তাকে দেখাতে পার? ছোট বৌ বলে পারি যদি না থাকে মশারি। কনকলতা কত ফন্দি করে মশারি খুলতে। সোনা-রুপোর জাল ছেঁড়েও না খোলেও না।

সেকরা একদিন ছোট বৌয়ের গয়না গড়াতে এল—হাতে তার সোনাকাটা কাঁচিখানা। ছোট বৌ চুপিচুপি সেটা লুকিয়ে রাখলে।

একদিন কনকলতার ঘরের মেঝেতে ছোট বৌ একটার পর একটা পদ্মফুলের আলপনা দেয় আর হাসে। কনকলতা দেখে-দেখে বলে—হাসছ কেন? ছোট বৌ বলে—আজ তোকে ঘরের বাইরে নেবো। কনকলতা চোখ মুছে বলে—জাল যে ঘেরা রইল ভাই। ছোট বৌ ছোট্ট কাঁচি দেখিয়ে বলে—দেখছিস্ এই অস্তরে জাল কাটবো। কনকলতা চেয়ে থাকে ছোট বৌ জাল কাটে—মশারি খুলে যায়, মেয়ে নামে ভুঁয়ে। আলপনার পদ্মে পা রেখে রেখে চলে। দুয়োর গোড়ায় এসে ভয় পায়, মশারিতে ঢুকতে যায়। ছোট বৌ তার হাত ধরে বাইরে আনে। রাজপুত্তুরের হাতে সঁপে দেয়—কনকলতাকে। পক্ষীরাজ ঘোড়া উড়ে চলে যায় মন্ত্রীর মেয়ে আর রাজার পুত্তুরকে নিয়ে রাজভবনে। সেখানে দুজনে বিয়ে হয় মালা বদল কোরে।

রাজার ঝি, রাজার বৌ, তারা সব সুন্দর। কারো নাম পদ্মমুখী, কারো নাম চম্পাকলি। নতুন বৌ দেখে বলে, ওমা এই বুঝি!— তোর নাম কি লা? কনকলতা চোখ মুছে বলে —কনকলতা। 'আমার মাথা'— বোলে রাজার ঝি রাজার

বৌ তারা চলে যায়। মন্ত্রীর মেয়ে রাজপুত্তুরের গলা ধরে কাঁদে আর বলে— ওগো আমি সত্যি কনকলতা। রাজপুত্তুর হেসে বলেন— তা তো জানি, ওরা শুধুই নামে কেউ পদ্মমুখী, কেউ চম্পাকলি। আড়াল থেকে রাজার ঝি, রাজার বৌ— তারা বেরিয়ে এসে বলে— আহা কনকলতাকে আমাদের মালঞ্চে পুঁতে দিলে হয় না?— আমরা ফুল পরে বাঁচি! কনকলতা ভুরু কুঁচকে বলে— পুঁতে দেখ না, ফুল ফোটে কিনা —কনকলতায়! রাজার ঝি, রাজার বৌ কিনা— যেমন কথা তেমনি কাজ!

সবাই ধরাধরি কোরে পুকুরঘাটে কনকলতাকে পুঁতে রেখে এল দিনের বেলায়। রাজপুত্তুর নাইতে এসে দেখেন পুকুর-পাড়ে সোনার লতায় থোকা-থোকা ফুল ঝুলছে। তিনি দুটি ফুল তুলে মা-বাপকে দেন, রাজার ঝি, রাজার বৌদের পাঠান; আর এক বোঁটায় দুটি ফুল নিয়ে যান পুজোর ঘরে। ঠাকুরের পায়ে ফুল দিতে কনকলতা সামনে এসে দাঁড়ায়। রাজপুত্তুর বলেন…তুমি! 'আমিও পুজোয় এসেছি—' বোলে কনকলতা রাজপুত্তুরকে প্রণাম কোরে বলে সকল কথা।

রাজার ঝি, রাজার বৌ— তারা খোঁপায় সোনার ফুল সাজিয়ে পুজো দিতে আসে— কনকলতাকে দেখে রাজপুত্তুরের পাশে। কনকলতার রূপে তাদের চোখ ক্ষরে যায়। বুড়ো রাজা-রানী আসেন মন্ত্রীর সঙ্গে পুজো দেখতে। রূপ দেখে রাজা-রানী অবাক হয়— মন্ত্রীর চোখে জল বয় থেকে-থেকে!



বড়রাজা ছোটরাজার গল্প

দুই রাজা থাকেন— বড় রাজা আর ছোট রাজা। দুজনে একদিন দিক্‌বিজয় করতে চল্লেন। বড় রাজা চল্লেন বড় বড় হাতী ঘোড়া কামান বন্দুক সাজিয়ে মস্তমস্ত জয়ঢাক পিটিয়ে বড় বড় সেনাপতির সঙ্গে, বড় বড় রাজত্ব জয় করতে করতে। এদিকে ছোট রাজা, তিনি চল্লেন ছোটলোকের সাজে, ছোট ছোট খেলবার কামান বন্দুক হাতী ঘোড়া নিয়ে ছোট একটি পুটলি বেঁধে ছোট রাজত্ব জয় করতে—বড় রাজার পিছনে-পিছনে।

মস্ত বড় এই পৃথিবী— বড় রাজা ক্রমে ক্রমে তা জয় করে ফেল্লেন— এমন সময় চর এসে খবর দিলে— মহারাজ, শুনে এলুম, ছোট রাজা ছোট রাজ্য নিয়ে সুখে রয়েছে।

বড় রাজা বল্লেন— তাকে বল, আমি পৃথিবীটা জয় ক'রে নিয়েছি, সে রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র যাক্।

দূত গেল ছোট রাজার কাছে। কিন্তু ছোট রাজার সে রাজ্য এত ছোট যে দূত দেখতেই পেল না কোথায় বা রাজা,

কোথায় বা রাজত্ব। সে ফিরে এসে বড় রাজাকে খবর দিলে—চক্ষুর অগোচর সে রাজত্ব ; সেখানে প্রবেশ করা ভারী কঠিন।

বড় রাজা বড়ই খাপ্পা হ'য়ে বল্লেন— চলো আমি নিজে যাবো।

বড় রাজা মস্ত মস্ত হাতী ঘোড়া রথ রথী নিয়ে চল্লেন পৃথিবী কাঁপিয়ে। কিন্তু ছোট শহর এত ছোট যে, সেখানে হাতী চলে না, ঘোড়া চলে না। মন্ত্রীরা মন্ত্রণা দিলে— সবাই চোখে অনুবীক্ষণ লাগিয়ে যুদ্ধে চল!

সেনাপতি বল্লেন—এতে কোরে চোখ চল্‌বে, গোলাগুলি চলার উপায় হবে না।

রাজা বল্লেন— দেখাই যাক্ না।

যুদ্ধ বাধলো— সেনপতির পায়ের তলা দিয়ে ছোট রাজার ফৌজ গলে পালালো। তীর কামান আন্দাজ ঠিক করতে না পেরে বাতাসে হানা দিতে থাকলো, নয়তো আকাশে ঘুরে ঝুপ্‌ঝাপ্ বড় রাজার ছাউনির উপর পড়তে লাগলো। বড় বড় অস্তর— সে সব বড় জিনিসকেই লক্ষ্য করে, ছোটকে দেখতে পায় না। বড় রাজা, বড় বড় মন্ত্রী, বড় বড় সেনাপতি ফাঁপরে পড়ে ছোট রাজার সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন। ছোট রাজা হেসে বল্লেন— দাদা, তুমি তোমার মস্ত রাজত্ব নিয়ে সুখে থাক। ছোটতে বড়তে সন্ধি হ'লে কি হয় তা জান না কি?

বড় রাজা বল্লেন— তা কি আর জানিনে?

মন্ত্রীরা বল্লেন— তা আর জানেন না?

সেনাপতি বল্লেন — এত বড় পৃথিবীটা জয় করে এলেন বড় রাজা, এটুকু আর জানেন না?

ছোট রাজা বল্লেন—তা হ'লে এবারকার মতো এইটুবু জেনেই ঘরে যান সকলে। আরো কি জানতে চান ? ৩৩

বড় রাজা বড় রেগে বল্লেন— ছোটকে টুঁটি চেপে ধরলে সে কি করে তাই জানতে চাই। বলেই বড় রাজা নিজের মস্ত মুঠোয় ছোট রাজা, মায় তাঁর রাজত্বটা পর্য্যন্ত কষে চেপে ধরলেন। জল যেমন গলে পালায় তেমনি বড় রাজার মোটা-মোটা আঙুলের ফাঁক বেয়ে ছোট রাজা, মায় তার রাজ সিংহাসন রাজপুরী সমস্তই বেরিয়ে গেল। বড় রাজা হাত খুলে দেখলেন মুঠো খালি ; বুড়ো আঙুলের গোড়ায় মৌমাছির হুলের মতো একটা কি বিঁধে রয়েছে। যন্ত্রণায় বড় রাজার আঙুলটা ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠলো দেখতে-দেখতে।

কাঁচায় পাকায়

বাদশার আগাগোড়া পাকা দাড়ির মাঝে একটি মাত্র কাঁচা ও বেগমের সব কাঁচা চুলের মধ্যে একটি পাকা চুল দেখা যায়। বেগমের কিছুতেই পছন্দ হয় না বাদশার দাড়ি—তা যতই কেন বাদশা আতর কস্তুরীতে দাড়ি মাজুন। ওদিকে বেগমসাহেবা—তিনিও মাথায় হীরে মুক্তোর ঝাপটা সিঁথি পরে মাথাঘসা মেখেও সেই একগাছি পাকা চুল বাদশার চোখ থেকে ঢেকে রাখতে পারেন না। দুজনে দুজনকে দেখে মুখ ফেরান, দুজনেই মনের দুঃখে থাকেন, শেষে এমন হ'ল, যে বাদশার দরবারে কাঁচা-দাড়ি এবং বেগমের দরবারে পাকা চুল যাদের তাদের টেকাই দায় হল। কবি আসে, কালোয়াত আসে, ছবিওয়ালী আসে, চুড়ীওয়ালী আসে, কেউ খাতির পায় না, উল্টে বরং ধমক খায়, গর্দ্দানি খায়, সরে পড়ে প্রাণ নিয়ে। উজির ভেবেই অস্থির—কি উপায় করা যায়! নাপিত নাপ্তিনীকে উজির ডেকে বলেন—তোরা সাঁড়াশি দিয়ে চুল-দুগাছা উপড়ে দে, আপদ চুকুক। হাজাম হাজামিন্ দুজনে ভয়ে শিউরে উঠে বলে—দোহাই উজির সাহেব, এমন কাজ আমাদের দ্বারা হবে না—সাঁড়াশি দিয়ে আমাদের দাঁত উপড়ে ফেলতে বলেন তো পারি, বাদশা বেগমের উপর অস্তর চালাই এমন নেমকহারাম আমরা নই! উজির নিশ্বাস ফেলে গালে হাত দিয়ে বসেন! কি উপায়!

মোল্লা দো-পেঁয়াজা পেঁয়াজ, রসুন খেতে বড়ই ভালবাসেন, কিন্তু হাতে পয়সা নেই মাষকলাই কেনবারও। ফতোয়া দেন

মস্‌জিদে দু-বেলা; কোন ফল হয় না। তাঁর বিবি তাঁকে বলেন—দেখ, এই সময় বাদশা বেগমকে খুশি করতে পারতো কিছু হতে পারে।

মোল্লা দো-পেঁয়াজা বল্লেন—তা জানি, পেঁয়াজও হতে পারে পয়জারও হতে পারে।

বিবি বল্লেন—দেখনা চেষ্টা করে। কিছু না হওয়ার চেয়ে সে-ও যে ভাল।



মোল্লা সকালে কোমর বেঁধে মজলিসে হাজির! দেখেন সবাই যে যার দাড়ি মোচড়াচ্ছেন আর চুপ ক'রে বসে আছেন। এমন কি যার দাড়ি গোঁফ কিছুই নেই সেও হাত বোলাচ্ছে শুধু গালের ওপরটাতেই। নাচ গান আমোদ আহ্লাদ সব বন্ধ।

বাদশা মোল্লার দিকে চাইতেই মোল্লা মস্ত এক সেলাম ঠুকলেন, কিন্তু বাদশার উচ্চবাক্য নেই। তখন মোল্লা একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে যে ভাবে ফতোয়া দেয় লোকে সেইভাবে সুর করে গান সুরু করলেন দাড়ি নেড়ে, যথা,—

আব্ দাড়ি চাপ্ দাড়ি,
বুলবুল চস্‌মেদার দাড়ি,
কুল্‌পাক্কা এক কাঁচ্চা
ওহি দাড়ি সব্‌সে আচ্ছা।



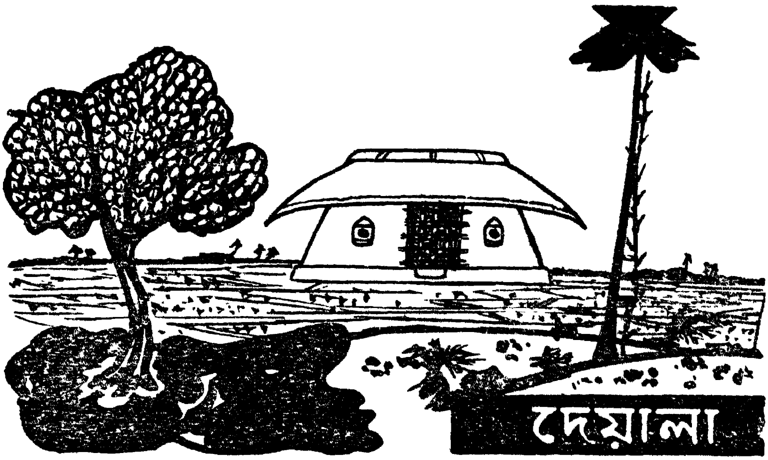
বাদশা খুশি হয়ে তালে-তালে ঘাড় নাড়ছেন দেখে দো-পেঁয়াজা আবার গাইলেন—

এক দাড়ি মান মনোহর,
এক দাড়ি ভব্বো।
এক দাড়ি খালিফ্ ফজিহৎ
এক দাড়ি ঠচ্‌ঢো।
সদর পাক্কা অন্দর কাঁচ্চা
ওহি ওহি সব্‌সে আচ্ছা।

শুনে-শুনে বাদশা একগাল হেসে ফেল্লেন, সেই সময় অন্দরেও হাসির রোল উঠলো, পর্দ্দার আড়ালে। এক সঙ্গে বাদশা-বেগম আমির-ওমরা এবং শহরের কাঁচা পাকা যে কেউ খুশি হয়ে গেল। মোল্লার আর প্যাঁজ রসুন ধরে না ঘরে। শহরের বাড়ি-বাড়ি দাড়ির গান উল্টে পাল্টে লোকে গাইতে থাকলো, যার যেমন খুশি সুরে—

(দাড়ির গান)

আব্ দাড়ি চাপ্ দাড়ি,
বুলবুল চস্‌মেদার দাড়ি—
কুল্‌পাক্কা এক কাঁচ্চা
সব্‌সে দাড়ি ওহি আচ্ছা !
এক দাড়ি মান মনোহর,
এক দাড়ি ভব্বো,
এক দাড়ি খালিফ্ ফজিহৎ,
এক দাড়ি ঠচ্‌ঢো !— .
সদর পাক্কা অন্দর কাঁচ্চা
ওহি ওহি সব্‌সে আচ্ছা !
লম্বে দাড়ি ওহি আচ্ছা ।
ছোটে ছোটে ওভি আচ্ছা ।
দাড়িমে সভি সচ্চা ।
পাক্কে কাচ্চে সভি আচ্ছা ।
'আচ্ছা আচ্ছা' বোলি সাচ্চা ।



দেয়ালা

এক যে ছিল গাছ তার ছিল এক ছাওয়া ; এক যে ছিল মাঠ তার ছিল এক গাছ ; আর এক যে ছিল কুঁড়ে তার ছিল একটা ঝাঁপ—সেটা কখন খুলতো কখন বন্ধ হতো। ঝাঁপ যখন বন্ধ হতো তখন ঘরটা কিছুই দেখতো না, অন্ধকারে পিদুম জ্বালিয়ে কুঁড়ে নিজের ভিতরটার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকতো—পিদুমের আলো ঝিমোতো, ঘরের জিনিস-পত্র ঝিমোতো, ঘরের মধ্যে যে কুঁড়ে মানুষগুলো তারাও ঝিমোতো, কিন্তু ঝাঁপ খুললে আর রক্ষে নেই—পিদুমের আলো পিলসুজ ছেড়ে দৌড় দিত—সেই সে মাঠে যেখানে গাছে আর গাছের ছাওয়াতে কথা চলা-চলি করছে। ছাওয়া শুধোচ্ছে গাছকে—ভাই কি দেখছিস ?

ছোট গাছ সে এদিকে ওদিকে চায়, চোখের পাত মেলে আর বলে, মাঠ দেখছি !

মাঠের পরে কি ভাই ?

মাঠের পরে একটা তালগাছ দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

তারপর ?—

গাছটা হঠাৎ চুপ করে আর থির হয়ে চেয়ে থাকে। গাছের ছাওয়া সেও চুপ্‌চাপ্‌, গল্প শোনবার জন্যে সটান শুয়ে থাকে মাটিতে।

ধূ ধূ মাঠের ধুলো মাটি, খোয়াই-জোড়া রাঙা মাটি বাঁধের ধারের পোড়া মাটি—তারাতো চেনেনা ছোট গাছ আর তার এতটুকু ছাওয়াকে, তারা চলে যায় সেই যে তালগাছ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তার কাছে, আর বলে—দেখলে কিছু ?

তালগাছ দাঁড়িয়েই থাকে—হেলেনা, দোলেনা, বলেনা কিছু। তেপান্তর মাঠ স্তব্ধ হয়ে ভাবে—'এত উঁচু থেকেও দেখা যায় না ? অবাক হয়ে মাঠ চেয়ে থাকে—খুব উঁচুতে যে নীল আকাশ তারই পানে, আর মনে-মনে বলে—আকাশকে কেমন করে শুধোই ওখান থেকে ও কি দেখতে পাচ্ছে মাটি শুধোতে পারে না আকাশকে, সে কি দেখছে! আকাশ বলতে পারে না মাটিকে সে যা দেখছে! এইভাবে এ ওর দিকে চেয়েই আছে; দুপুর বেলা সবাই সবার দিকে দেখছে কিন্তু কেউ কিছু বলে না, কয় না!

চুপচাপ থেকে-থেকে গাছের চোখের পাতা ঝিমিয়ে এল, গাছের সাথী ছাওয়া মাটিতে নেতিয়ে পড়ে, ঘুমের ঘোরে দেয়ালা করে বলে উঠল—মাঠের পরে তালগাছ পাহারা দিচ্ছে, তারপর ?

ছোট গাছ হঠাৎ চট্‌কা ভেঙে জেগে উঠে বল্লে—তাল-গাছটার মাথার উপরে একটা পাখি উড়ছে, যেন ঘুরে ঘুরে কি খুঁজে চলেছে!

গাছের ছাওয়া ছোট্ট একটা নুড়ির উপরে দাঁড়িয়ে বল্লে—আমি দেখবো।

বাতাস এতক্ষণ চুপ করে ছিল, বলে উঠলো—ইস্‌স্‌। ছোট গাছ হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল!

মাঠের শেষে পাহারা দিচ্ছিল যে উঁচু গাছ সে এইবার মাথা নেড়ে বল্লে—দেখবেই তো, দেখবেই তো। লজ্জায় ছোট গাছের ছাওয়া মাথা হেঁট করে মাটিতে মিলিয়ে গেল।

সন্ধ্যার আকাশের কোলে দেয়ালা দিচ্ছিল একখানি মেঘ, একবার সে রঙীন আলোয় রাঙা হয়ে উঠেই আবার ঘুমিয়ে পড়লো—নীল আকাশের আঁচলের আড়ালে। এমন সময় গাছ বলে উঠল—ছাওয়া। সাড়া নেই। গাছ ফিরে-ফিরে দেখে—ছাওয়া পালিয়েছে। গাছ মাটিকে বল্লে—ছাওয়া গেল কোথা?

মাঠ বল্লে—এই তো ছিল গেল কোথায়?

তালগাছ বল্লে—ছাওয়ার মতো কে যেন ঐ পুব মুখে রোদে পুড়তে পুড়তে চলে গেল আমি দেখেছি।

আকাশ বল্লে—শুধোই তো রোদকে ছাওয়া যায় কোন্‌খানে?

সেই তালগাছের ওপারে যে তেপান্তর মাঠ, তার ওপারে যে নদী, তারও ওপারে যাকে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, তার কোণে যে রোদ সে দেয়ালা দিয়ে হেসে বল্লে—বলবো না।

তার পরেই আলোর চোখ ঢুলে পড়লো। সবাই—এমন কি গাছের পাতা, ফুল, পাখি, ঘাটে মাঠে হাটে যে যেখানে ছিল বলে উঠল, কোথায় গেল সে? কোন্‌ দেশে? গাছ আর মাঠ আর আকাশ আর বাতাসের মন ছোট ছাওয়াকে খুঁজে যখন কোথাও পেলে না তখন তারা মুখ আঁধার করে ভাবতে লাগলো—গেল কোথায়, এই ছিল? তারপর সবাই ঘুমিয়ে

গেল ঘরে বাইরে ; শুধু তারাগুলো থেকে-থেকে দেয়ালা করে চায় আর ভাবে গেল কোথায় ?

গাছ ঘুমোয়, গাছের পাতা ঘুমোয়, মাঠ-ঘাট ঘুমোয়, মেঝেয় পড়ে কুঁড়ে মানুষ ঘুমোয়—সবাই স্বপন দেখে ছাওয়া তাদের বড় হয়েছে! সেই সে এতটুকুখানি ছাওয়া—যে মাঠের শেষ দেখতে চাইতো, পাখিদের সঙ্গে পাখি হয়ে উড়ে পালাতে চাইতো আকাশের শেষে—সে এখন সেই সব তেপান্তর মাঠের চেয়ে সেই নীল আকাশের চেয়ে বড় হয়ে গেছে! ভয়ে গাছ-পালা মাঠ-ঘাটের গা ঝিম-ঝিম করতে থাকে আর একবার চমকে উঠে তারা স্বপন দেখে, দেয়ালা করে, হাসে, কাঁদে, চায় আর ঘুমোয়। অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে সাঁতরে চলে একটার পর একটা বাদুড় ছাওয়াকে খুঁজতে-খুঁজতে দূর-দূর দেশে। সেই সময় চুপি-চুপি আলো আসে—একটুখানি চাঁদের আলো—বাতাসের গায়ে আলো পড়ে, গাছের শিয়রে আলো পড়ে, ঘুমের ঘোরে সবাই বলে—ছাওয়া ? ঘুম ভাঙানো পাখি ডেকে বলে—ওই যে আলো, ওই যে ছাওয়া! চমকে উঠে গাছ দেখে ছাওয়া!

ছাওয়া বলে—তারপর ?

গাছ বলে—ধূ ধূ করছে মাঠ তার মাঝে একটি গাছ পাহারা দিচ্ছে—চুপ করে দাঁড়িয়ে।

ছাওয়া বলে -দেখনা ভাই ভাল করে তার পরে কি ?

গাছ বলে—সেই একটি গাছ তার পরে রয়েছে আলো, না আলো তো নয়, একটা আলো মাখা মেঘ!

ছায়া বলে—সে আবার কি ?

গাছ বলে—তা জানিনে ভাই কিন্তু কালো ঠিক তোর

মত ঠাণ্ডা রং তার। হঠাৎ ছাওয়ার উপর দু-ফোঁটা জল পড়ে—।

ছাওয়া বলে—ওকি কাঁদছিস্ কেন ?

গাছ মাথা দুলিয়ে বলে—কাঁদবো কেন ?

ছাওয়া বলে—এই দেখ্ না জল !

কুঁড়ে তার ঘরের ঝাঁপখানা ঝুপ করে বন্ধ করে দিয়ে বলে—বিষ্টি রে বিষ্টি।

টিপির টিপির জল ঝরে, আকাশ ঝিলিক্ দিয়ে থেকে-থেকে দেয়ালা করে, বাতাস করে সারারাত এপাশ-ওপাশ। তারপর রাত কাটে, সকাল হয়, আকাশ জেগে ওঠে, আলো জেগে ওঠে, গাছপালা জেগে ওঠে, পাখি জেগে ওঠে, সেই সঙ্গে তাদের ছাওয়ারাও জেগে ওঠে।

ছোট গাছের ছাওয়া বলে গাছকে—আজ কি খবর ?

গাছ বলে—আজ দেখছি কি জানিস ?

ছাওয়া বলে—কি ?

গাছ বলে—সেই আমাদের পাতায় ঢাকা কুঁড়ি আজ ফুটেছে।

ছাওয়া বলে—তারপর ?

গাছ বলে—প্রজাপতি তাকে দেখতে এল সোনার ডানা মেলে।

ছাওয়া বলে—তারপর—?

গাছ বলে—রোদ পড়ল তার গায়ে, বাতাস তাকে দুলিয়ে গেল।

ছাওয়া বলে—ওকে আমায় দে।

গাছ বলে—এই নে দেখ্ কেমন সুন্দর ফুল।

ফুলকে বুকে নিয়ে ছাওয়া বলে—ফুল! ফুল কথা কয় না।

ছাওয়া গাছকে বলে—ফুল কথা কয় না যে ?

গাছ বলে—ঘুমিয়ে আছে, জাগাস্‌নি। ফুল ঘুমিয়ে থাকে ছাওয়ার বুকে, ছাওয়া নড়ে চড়ে ফুলকে দেখে। গাছ নড়ে চড়ে শুধোয়—কি করছে ?

ছাওয়া বলে—ঘুমোচ্ছে। এক এক সময় বাতাস এসে ফুলকে ছুঁয়ে যায়, ছাওয়া বলে—দেয়ালা করছে আমাদের ফুল। কুঁড়ের ঝাঁপ খুলে দেখে মানুষ, গাছের তলায় ঝরা ফুল, তার গায়ে ছাওয়া হাত বোলাচ্ছে। কুঁড়ে মানুষের ছেলেটা বেরিয়ে আসে, ফুল তোলে বেড়ায় গাছে গাছে।

গাছ বলে—কি করবি ফুল নিয়ে ?

ছেলে বলে—খেলা করবো। ফুল তুলে ছেলে চলে যায়। মেয়ে আসে, সে এতটুকু—গাছে হাত পায় না, ছাওয়ায় ছাওয়ায় ফুল কুড়িয়ে বেড়ায়।

ছাওয়া বলে—কি করবি ফুল নিয়ে ?

মেয়ে বলে—ওকে মালায় গেঁথে ধরে রাখবো।

ছাওয়া বলে—তারপর খেলা হলে ফিরিয়ে দিবি তো ?

মেয়ে 'দোব না' বলে ফুল আঁচলে তুলে নেয়।

ছাওয়া তার পা জড়িয়ে বলে—'নিয়ে যেওনা।'

গাছ বলে—যাক না নিয়ে, কাল সকালে দেখবি তোর ফুল পালিয়ে এসেছে তোর বুকে। দিন কাটে, রাত কাটে, ফুলের স্বপন দেখে গাছ আর গাছের ছাওয়া দুজনে মিলে; সকালে কুঁড়ি ফোটে গাছে, ফুল ফেরে ছাওয়ার কোলে।



সায়দা-বাদের ময়দা

কাশিম-বাজারের ঘী

একটু বিলম্ব কর লুচি ভেজে দি ?

কিন্তু তর সইল না। ন-পাড়ার মধু খাতাঞ্চির ডানপিটে ছেলেটা রাস্তায় খেলতে খেলতে আদুল গায়ে খালি পায়ে গোরা ফৌজের সঙ্গ নিয়ে সরাসর পাটনায় গিয়ে হাজির। তখন নানা সাহেবের সঙ্গে লড়াই চলেছে; সেই মরসুমে চাকরি পেয়ে গেল মধু খাতাঞ্চির কালো ছেলেটা,—কাপ্তান সাহেবের বুট পালিশের চাকরি, তার সঙ্গে ঘোড়া মলা, চিঠি বওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকগুলো কাজ যা করতে দু-এক গৎ ইংরিজি শেখা ছাড়া উপায় ছিল না রামধনের। লড়াই যখন শেষ হয়েছে তখন

রামধন এতটা ইংরিজি শিখেছে যে সত্যি মিথ্যেয় মিলিয়ে একটা চটি বই লিখেছে—নানা সাহেবের যুদ্ধের ইতিহাস। সেই ইতিহাস সে একদিন সুযোগ বুঝে কাপ্তান সাহেবের খানার টেবিলে ছোট হাজরির সঙ্গে পরিবেশন করে বসলো। কাপ্তেনের মেম সেটা পড়ে এত খুশী হলেন যে তৎক্ষণাৎ রামধনকে তিনি সাহেবের একজোড়া পুরোনো বুট মায় সিকি বোতল বুটের কালি উপহার দিলেন এবং সাহেবকে বলে কয়ে এক স্যুট পুরোনো কাপড়ও দেওয়ালেন তাকে।

লড়াই শেষে রামধন সাহেব সেজে দেশে হাজির। বইখানাও তার গেল ছিরামপুরে ছাপা হতে আঠারো শত ঊনপঞ্চাশ খৃঃ অব্দে পয়লা এপ্রিলে।

হোলদারি বুট আর মাথামুণ্ডু নানার কাহিনী—এরি জোরে রামধন হয়ে উঠলো দেশের একজন কেষ্টবিষ্টু। তার দপ্‌দপার চোটে গাঁয়ের লোক শশব্যস্ত হয়ে তার নামে একটা ছড়া রচনা করে ফেল্লে, রচয়িতা কে তার ঠিকানা নেই, কিন্তু নাম হল কবিরাজ মশায়ের—

রামা এলেন গাঁয়ে
বুট্ জুতুয়া পায়ে,
ওরে কে বলিবে কালো
পাটনা থেকে হলুদ মেখে
গা হয়েছে আলো।

খড়ের চালে আগুন যেমন, তেমনি এই গীতটা দেখতে দেখতে ন-পাড়া এবং সারা তল্লাট্‌টায় ছড়িয়ে পড়লো। ছেলেদের আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না; তারা এ ওর মুখ থেকে লুফে নিয়ে গানটার ধুলোট সুরু করে দিলে দু-বেলা পথে

ঘাটে এবং বিশেষ করে খাতাঞ্চি সাহেবের কোটা বাড়ীর সামনেটাতে।

একটা ভাঙা দোনলা বন্দুক নিয়ে রামা মাঝে মাঝে তাড়া করলে ছেলেদের। তারপর সে পাড়া ছাড়বার আয়োজন করলে কিন্তু যাবার আগে কবিরাজ মশায়কে একটু শিক্ষা দেবার কুমৎলব তার মাথায় এল।

ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদপত্র প্রভাকর তখন দেশের সবাই পড়ে। একদিন সকালে কবিরাজ মশায় তামুক ধরিয়ে বাবুদের বৈঠকখানায় বসে গালগল্প করছেন এমন সময় কর্ত্তা এসে বল্লেন— কবিরাজ মশায় দেখেছেন কাগজে আপনার নামে কি বেরিয়েছে!

কি কি!—বলে কবিরাজ কাগজটা টেনে নিয়ে দেখেন বড় বড় করে ছাপা—রামা খাতাঞ্চি প্রশংসাপত্র দিচ্ছেন ন-পাড়ার শ্যামনাথ কবিরাজকে যথা:—"ন-পাড়ার কবিরাজ মশায়ের প্রস্তুত মাসতৈল আমি পাটনা হইতে ফিরিয়া পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতেছি। ইহাতে হোল্‌দারি বুট সুন্দর পালিশ হয়, বিশেষতঃ বাত রোগীর জুতা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাঁকিয়া চুরিয়া গেলে এই তৈল বাঁকাকে সোজা করার পক্ষে বিশেষ কাজে আসে, ইহা আমি পরীক্ষা করিয়া বলিতেছি।"

কবিরাজ ছিলেন বিষম গম্ভীর লোক—রাগলেন কিনা বোঝা গেল না; কিন্তু তিনি কর্ত্তা বাবুর অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও প্রভাকরের নামে কিছুতেই মানহানির মকদ্দমা আনতে রাজি না হয়ে গুম্ হয়ে খানিক বসে থেকে বৈঠকখানা ছেড়ে উঠে সোজা বাড়ীর দিক চলে গেলেন দেখা গেল।

যেমন রামধনের গীত তেমনি প্রভাকরের খবরটাও দেখতে

দেখতে আগুনের মত পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়লো। পাড়ার ছেলেরা কোমর বেঁধে কবিরাজ মশায়কে এসে বল্লে—বলেন তো রামাকে শিক্ষা দিয়ে আসি, আপনার সঙ্গে লাগে এত বড় সাহস তার!

কবিরাজ হেসে বল্লেন—তোরা সব ঘরে যা, এখন ডাক্তারি মালিশের দিন এল, মাস তৈল তো কেউ আর নেবে না, বুট পালিশে লাগে যদি তেলটা লাভ তো কম হবে না বরং বাড়বেই দাম, যা তোরা পাঠশালে যা।

এই ঘটনার পর থেকে তিন রাত্রি যেতেই শোনা গেল রামধন তার বুট পরে দাওয়া থেকে উঠোনে নামতে পা পিছলে পড়ে একেবারে খোঁড়া হয়ে শয্যাগত, উত্থান শক্তি রহিত, বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে।

ছেলের দল হোররা দিয়ে কবিরাজ মশায়কে এই খবরটা দিতে এসে দেখলে কবিরাজ বাড়ীতে নেই, দরজায় এই বিজ্ঞাপন আঁটা বড় বড় করে হাতের লেখায়।—"মাস তৈলের অপব্যবহারে বাতও সারে না হাড়ও ভাঙ্গে এইটুকুই জানিয়া আমি কাশী যাত্রা করিলাম, অপব্যবহারীর গঙ্গাযাত্রার ভার বালকদের উপরে রহিল।"



ভোম্বলদাসের কৈলাস যাত্রা

সিংহির মামা ভোম্বলদাস নেহাৎ সেকালের জানোয়ার; রাজকার্য্য চালাবার মতো বুদ্ধিও তাঁর ছিল না, গায়ের জোর যে খুব ছিল, তাও নয়; খোস-মেজাজে সেজে-গুজে সিংহাসনে বসে আয়েস আর আমোদ-আহ্লাদ করতেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। রাজকার্য্য করবার নাম শুনলে তাঁর জ্বর আসত,—লড়াই করা তো দূরের কথা। কিন্তু দেশবিদেশের সবাই তাঁকে খুব মস্ত রাজাই বলে জানত। সবাই বল্‌ত—"সিংহির মামা ভোম্বলদাস, বাঘ মেরেছে গণ্ডা দশ!"

যে ভোম্বলদাস ঘরের কোণে আরসোলা উড়লে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়, সে কেমন কোরে দশ গণ্ডা বাঘ মারলে? ভোম্বলদাসের একটি মস্ত গুণ ছিল; সেটি হচ্ছে মন্ত্রী বেছে নেবার। দেখে-দেখে তিনি শেয়াল-পণ্ডিতকে আপনার প্রধান মন্ত্রী কোরে নিয়েছিলেন; আর তাঁরই পরামর্শে দশ গণ্ডার চেয়েও ঢের বেশী বাঘ মেরে তিনি পশুদের মধ্যে একচ্ছত্র রাজা হয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন।

কিন্তু কপাল! বনের যত জোরোয়ার জানোয়ার দেশের চারিদিকে সুখ-শান্তি দেখে ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠলো। তারা কোথাও একটা লড়াই বাধিয়ে খানিক হাঁকাহাঁকি দাপাদাপি

মাথা ফাটাফাটি করতে ভোম্বলদাসকে ধরে পড়লো। ভোম্বলদাস শেয়ালের সঙ্গে যুক্তি কোরে বল্লেন,—"আমার শত্রু যারা ছিল সব তো যমের বাড়ী পাঠিয়েছি ; লড়াই হবে কার সঙ্গে ?"

দুষ্টু জানোয়ার, তারা আগে হতেই সড় কোরে এসেছিল ; তারা পিঁপড়েদের ক্ষুদে শহরের উপর চড়াও হয়ে লড়াই দেবার জন্যে অনুরোধ করলে। শেয়াল-পণ্ডিত বল্লেন—"এমন কাজ কোরো না ! তারা দেখতে ছোট কিন্তু কামড়ালে আর রক্ষে নেই।"

সবাই হেসে শেয়ালের কথা উড়িয়ে দিলে। লড়াই বাধলো। জীবনের মধ্যে ভোম্বলদাস এই এক ভুল করলেন,—বুদ্ধিমানের কথা ঠেলে, গায়ের জোরের মান রাখতে গেলেন। তার ফলও ফলতে দেরী হলো না। লড়াই তো যেমন হবার হলো কিন্তু ক্ষুদে শহরের একটি ইঁটও কেউ খসাতে পারলে না। উল্টে সিংহির মামা ভোম্বলদাস বুড়ো বয়সে হাতে-মুখে, নাকে-চোখে, কানে-ল্যাজে, বুকে-পিঠে, পেটে এমন কামড় খেলেন যে সর্ব্বাঙ্গ ফুলে ঢোল ! না পারেন চলতে, না পারেন বলতে। খেয়ে সুখ নেই, শুয়ে সুখ নেই, কাজে মন দিতে গেলে মাথা ঘোরে ; জানোয়ারদের মুল্লুকে রাজ কার্য্য অচল হলো। শেয়াল-পণ্ডিত মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। বাঘা-কোটাল, ভালুক-মন্ত্রী এমনি সব রাজ্যের বড় বড় আমির-ওমরা গো-বদ্যিকে ডেকে রাজার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করতে লাগলেন, কিন্তু ঘুঁটে-ভস্ম, গোবর-প্রলেপ এসবে কিছুই হলো না। তখন বকা-ধাম্মিক এসে ভোম্বলদাস মহারাজকে কৈলাস করবার ব্যবস্থা দিলেন। মহারাজও ভাগ্নে সিংহকে রাজ্যের ভার দিয়ে কিছুদিনের জন্যে কৈলাসের দিকে রওনা হতে প্রস্তুত হয়ে বল্লেন,—"আমি তো

চলৎ-শক্তিরহিত, আমাকে কেউ যদি রেখে আসে তো কৈলাসে যাওয়া—নচেৎ উপায় নাস্তি।"

বকা-ধার্ম্মিককে রাজার সঙ্গে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ দেওয়া হলো কিন্তু কৈলাসে দুরন্ত শীত, তার উপর সেখানে মাছ খাওয়া নিষেধ, কাজেই বকা পিছলেন। তিনি গেলে পশুদের ধর্ম্ম-কথা শোনায় কে? বাঘা-কোটালেরও ঐ একই কথা। তিনি না থাকলে গৃহস্থের গরু-জরু সামলায় কে? ভালুক-মন্ত্রী যেতে পারতেন, কিন্তু নতুন রাজা সিংহকে নিয়ে রাজকার্য্য চালাবার জন্যে সদরে থাকা তাঁর বিশেষ দরকার। কাজেই তাঁরও যাওয়া হয় না। শেয়াল-পণ্ডিতকে রাজা বল্লেন,—"পণ্ডিত, তুমি কি বল?" পণ্ডিত কি জানি কি ভেবে বল্লেন,—"জানোয়ারদের দেশে গায়ের জোরের চর্চ্চাই দেখছি বেশী, বুদ্ধির চাষ কম, সুতরাং এ-রাজ্য থেকে আমি চলে গেলে কোন কাজই আট্‌কাবে না। গর্দ্দভ রইলেন পাঠশালাগুলোর তদারক করতে। আমি মহারাজকে সশরীরে কৈলাসে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

রাজা খুশী হয়ে শেয়ালকে কৈলাস-যাত্রার আয়োজন করতে তখনি হুকুম দিয়ে সভা ভঙ্গ করলেন।

কৈলাসে শীত বিষম, কাজেই রাজ্যের ভেড়া মেরে শেয়াল তাদের ছাল সংগ্রহ করতে লাগলেন; আর পথে খাবার জন্যে ভেড়ার মাংস, ছাগলের মাথাগুলোও বোঝা বাঁধা হলো। এ ছাড়া নানা সুস্বাদ পাখি, খরগোস এমন কি রাজার জন্যে কচি কচি বাঘ-ভাল্লুকের গা থেকে ছাল পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে নেওয়া হলো। বকের পালকের বালিশ, লেপ, তোশক, গণ্ডারের ছালের প্যাঁটরা আর জুতো, মোষের সিঙের ছড়ি, গজদন্তের

খড়ম—এমনি নানা সামগ্রী শেয়ালের কাছে দিনে দিনে স্তূপাকার হয়ে উঠলো।

এ দিকে জানোয়ারদের ঘরে ঘরে কান্না উঠেছে, কিন্তু রাজার প্রয়োজনে এই সব সংগ্রহ করছেন শেয়াল-পণ্ডিত—কারো কথাটি বলবার সাধ্য নেই! ভাল্লুক-মন্ত্রী বকা-ধার্ম্মিককে বলে কয়ে যাতে রাজার চটপট যাওয়া হয়, এমন একটা ভালো দিন পাঁজি-পুঁথি দেখে স্থির করতে বলে দিলেন। সামনে অশ্লেষা-মঘা, সেই দিনই উত্তম বলে ঠিক হলো। প্রজারা সবাই রাজাকে বিদায় দিতে এলো। রাজার কৈলাস যাত্রার সাজ-সরঞ্জাম জুগিয়ে প্রজারা কেউ নুন-ছালের জ্বালায়, কেউ দাঁতের বেদনায়, কেউ বা ছেঁড়া-পালকের শোকে চোখ-মুখ ফুলিয়ে এসেছে দেখে, শেয়াল রাজাকে বুঝিয়ে দিলেন যে প্রজারা তাঁরই বিরহে ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন করছে। ভোম্বলদাস খুশী হয়ে সবাইকে আশীর্ব্বাদ কোরে রওনা হলেন। পিছনে শেয়াল তার দলবল রাজ্যের যা কিছু ধন-দৌলত আসবাব-পত্র নিয়ে রাজার সঙ্গে কৈলাস করতে চল্লো।

এদিকে গ্রামে গ্রামে ঘাটিতে-ঘাটিতে খবর এসেছে ভোম্বলদাস কৈলাস চলেছেন। সবাই রাজা দেখতে পথের দুই ধারে ভিড় লাগিয়েছে। ভোম্বলদাস রয়েছেন রাম-ছাগলের চামড়ার কম্বলে ঢাকা ডুলির মধ্যে। আর শেয়াল চলেছেন আগে আগে বুক ফুলিয়ে। পাড়াগেঁয়ে জানোয়ার তারা কোনো দিন রাজাকে দেখে নি। শেয়ালকেই রাজা ভেবে তারা দুহাতে সেলাম দিতে লাগলো; সঙ্গের ডুলিতে কম্বল মুড়ি দেওয়া ভোম্বলদাসকে দেখে তারা ভাবলে রানী।

সুন্দরবনের সিংহগড় থেকে শেয়াল-পণ্ডিতের বাড়ী জম্বুকগড়

হলো তিন হপ্তার পথ; আর কৈলাস তিন মাসেরও বেশী রাস্তা। বুড়ো ভোম্বলদাসের সঙ্গে দেশ ছেড়ে এতটা যাওয়া শেয়ালের আদপেই ইচ্ছা ছিল না। সে যত শীঘ্র পারে বুড়ো রাজার সঙ্গে তাঁর ধন দৌলত নিজের ঘরে এনে ফেলবার মতলবে আছে। এদিকে কিন্তু ডুলির মধ্যে ঝাঁকানি খেতে খেতে রাজার প্রাণান্ত হবার যোগাড় হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা ঘাটিতে ঘাটিতে যাওয়া। যেখানে ভালো গ্রাম দেখেন সেইখানেই রাজা বলেন,—"ওহে পণ্ডিত জায়গাটা তো ভালো বোধ হচ্ছে। দু-এক দিন এখানে থেকে গেলে হয় না ?"

শেয়াল অমনি বলে ওঠে,—"না মহারাজ, এখানে থাকা চলবে না, এটা হলো মশা ভন্‌ভনানির দেশ। রাত্রে নিদ্রা মেটেই হবে না—এগিয়ে চলুন !"

আরো কতদূর গিয়ে রাজা বলেন,—"ওহে এ স্থানটা কেমন ?"

"মহারাজ, এটা, হাড়মড়মড়ি শহর। এক ঘণ্টা এখানে কাটালেই বাতে ধরবে।"

"ওহে পণ্ডিত এ জায়গাটা ?"

"সর্ব্বনাশ। এটা পিঁপড়ে-কাঁদা গ্রাম। এখানে থাকা হতেই পারে না—না খেয়ে প্রাণ যাবে।"

এই ভাবে রাজাকে কখনো ভয় দেখিয়ে কখনো মিষ্টি কথায় তুষ্ট কোরে শেয়াল দিনরাত চলে এক হপ্তায় তিন হপ্তার পথ নিজের আড্ডায় এসে হাজির। কিন্তু শেয়ালের গর্ত্তে তো সিংহের মামা প্রবেশ করতে পারেন না, কাজেই বাইরে গাছ তলায় তাঁকে শোয়ানো হলো ; ধন-দৌলত সমস্তই শেয়ালের গর্ত্তে গিয়ে পৌঁছলো।

রাজা ডুলি থেকে কষ্টে মাটিতে নেমে বলেন,—“ওহে পণ্ডিত, কৈলাস কতদূর ?”

“কাছে মহারাজ ! ঐ যে কৈলাসের চুড়ো দেখা যায় !” রাজাকে কিছু দূরে একটা উই-ঢিপি দেখিয়ে দিলেন ।

রাজা খুশী হয়ে বল্লেন,—“তাহলে এই গাছ তলায় দিন কতক আরাম করা যাক ! একটু সুস্থ হয়ে পাহাড়ে ওঠা যাবে ।”

শেয়াল বললে,—“মহারাজ, এইখানে বসে কিছুদিন তপস্যা করেন ! পশুপতির কৃপায় দু-দিনেই রোগের শান্তি হবে ।” এই বোলে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে শেয়াল নিজের গড়ে গিয়ে প্রবেশ করলেন ।



রতা-শেয়ালের কথা

শেয়াল নিজের গড়ে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আরাম করুন, এদিকে হিমে গাছতলায় পড়ে ভোম্বলদাস তপস্যা করতে থাকুন। ওদিকে কি, রাজার চর টিকটিকি, সে নতুন রাজা সিংহের কাছে শেয়ালের এ সব খবর প্রকাশ কোরে দিয়েছে; আর অমনি সিংহ হুহুঙ্কার ছেড়েছেন।

তখন ফাল্গুন মাস; হিমালয়ের চুড়োয় বরফ জমাট বেঁধেছে কিন্তু সুন্দর বনে বসন্তকাল নতুন দেখা দিয়েছে—ফুলে-ফলে পাখির গানে মধুর গন্ধে জলস্থল মাতিয়ে তুলেছে। সবুজ পাতার চাঁদোয়ার তলায় দাঁড়িয়ে সিংহ-সিংহিনী ডাক ছাড়লেন; —নিমন্ত্রণ চিঠি পেতে কারো আর দেরী হ'লো না। জীব-

জন্তু যে যেখানে ছিল সব কাজ ফেলে সভায় এসে হাজির হতে লাগলো। বকা-ধার্ম্মিক সবআগে এসে লম্বা পায়ের ধুলো



রাজা-রানী ছাড়া আর সবার মাথায় বুলিয়ে দিয়ে, ঠোঁটে কোরে একটু খানি আঁষ-জল ছিটিয়ে রাজা-রানীকে "জয় জীব—স্বস্তি স্বস্তি" বোলে আশীর্ব্বাদ কোরে বসলেন। হরবোলা পাখি রাজার বিদূষক, ময়না রানীর সেঙাৎনী—দুজনে এসে ভাঁড়ামো জুড়ে দিলে। ভাল্লুক-মন্ত্রী, বাঘা-কোটাল, সেনাপতি-গজপতি, খড়্গ-সিং বরকন্দাজ, মহিষ-মহিষী, গোরু-গাধা-ছাগল-ভেড়া ছোট-বড় পাত্র-মিত্র সবাই একে-একে এসে জুটলো।

সিংহ শেয়ালের কথা পাড়লেন,—"এক যে ছিল শেয়াল তার বাপ একদিন আমার মামার বাড়ীর সদর আর অন্দর দুই মহলের মাঝে একটা দেয়াল দেবার হুকুম পেয়ে রাজ মজুরের কাজ করতে এলো। তার নাম ছিল রতা বা রতন। শেয়াল পণ্ডিত তখন খুবই ছোট, রতার বৌ তাকে কোলে নিয়ে চুন-সুর্কির ঝুড়ি বইতে এসেছিল। তখন তাদের অতি দৈন্য দশা।

"রতা-মিস্ত্রি তো দেয়াল তুলে দিলে। গজগীর-কোরে গাঁথা মোটা দেয়াল মামার সদর-অন্দরকে দুই ভাগ কোরে মেঘ ছাড়িয়ে উঠলো। মামা তো দেখে ভারি খুশী। কিন্তু মামী সেই দেয়ালের মধ্যে অন্ধকারে পচে মরবার যোগাড়। এদিকে মামারও অন্দরে যাবার পথ বন্ধ। কি উপায় করা

যায়? মামা দেয়াল ভাঙবার হুকুম দিলেন। কিন্তু পর্ব্বত প্রমাণ দেয়াল, তাকে ভেঙে ফেলা সহজ নয়! হাতী এলেন দেয়াল ভাঙতে, কিন্তু দেয়াল তেমনিই রইলো, লাভের মধ্যে হাতী দাঁত ভেঙে ফোগ্‌লা হয়ে ফিরে এলেন। ওদিকে ক্ষিদের জ্বালায় অন্দরের মধ্যে মামী এমন চীৎকার সুরু করলেন যে রাজ্যের লোকের কানে তালা ধরে গেল। ছোট-ছোট জানোয়ার তো ভয়েই মারা যাবার যোগাড়। রাজ্যে হুলুস্থুল!

"সবাই মামার দুর্ব্বুদ্ধির নিন্দে করতে লাগলো। পশুদের মধ্যে সদর-অন্দর—বাড়ীর মধ্যে বাইরে—এ সব কোনো কালে ছিল না; হঠাৎ নতুন-রকম কেতা করতে এ কি বিপদই মামা ঘটালেন। মামা রতা-শেয়ালকে ডেকে বল্লেন,—তিন দিনের মধ্যে এর উপায় কর, না হলে তোমার প্রাণদণ্ড করবো। কিন্তু হায়, রতা-শেয়াল দেয়াল দিতে-দিতেই বুড়ো হয়ে গেছে। দেয়াল তুলতেই সে পাকা, দেয়াল-সরানো বিদ্যেতে সে একেবারেই মজবুত ছিল না। যে দেয়াল সে একবার তুলেছে, তাকে নামানো তার সাধ্য হলো না। মামী মামার দেয়ালের মধ্যেই মরে রইলেন!

"অন্দরের মধ্যে মামীর চীৎকার বন্ধ হলো কিন্তু বাইরে থেকে মামা ভোম্বলদাস এমন হাঁক-ডাক কান্না-কাটি তম্বি-তম্বা সুরু করলেন যে রতা-শেয়াল ভয়েই মরে যায় বুঝি। আর তাকে ধোরে ছাল ছাড়িয়ে মাথা গুঁড়িয়ে একটু একটু কোরে মারবার সুবিধে হয় না দেখে বাঘা-কোটাল ভারি দুঃখিত হয়ে রাজাকে চুপ করবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলো। সেই অবসরে রতার ছেলেটা বাপকে বুদ্ধি দিলে। কোটাল এসে রতাকে

যখন ধরলে তখন দেখা গেল রতা মরেছে আর তার বৌ আর এই আমাদের রতা-শেয়ালের ব্যাটা শেয়াল পণ্ডিত মাথায় হাত দিয়ে কাঁদছে। রতাকে মেরে হাড়-গুঁড়িয়ে দেবার সুবিধে হলো না কিন্তু বাঘা-কোটাল রতার ল্যাজের চামরটা কেটে নিয়ে পতাকার মতো কোরে সেটাকে ফাঁসি-কাঠে লট্‌কে দিয়ে তবে শান্ত হলো।

"ছেলের বুদ্ধি নিয়ে রতা ল্যাজটা মাত্র দিয়ে সে-যাত্রা প্রাণ নিয়ে—রাতা-রাতি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সরে পড়লো বটে কিন্তু ল্যাজ তুলে সে দৌড় মারতে পারলে না—এর জন্যে শেয়ালের দলে সে ভারি লজ্জা পেলে। সবাই বল্লে,—এর চেয়ে যে মরাও ভালো ছিল! রতা-বুড়ো কাঁদতে কাঁদতে তার ছেলেকে এসে বল্লে—তোরই জন্যে আমার এই লাঞ্ছনা! তখন শেয়াল পণ্ডিত গম্ভীর মুখে ভাবতে বসলেন—কি কোরে সব শেয়ালকে জব্দ করা যায়!

"ছেলেটার অগাধ বুদ্ধি। ভাবতেই তার মাথায় একটা ফন্দি এলো। সে চট্‌-কোরে তার বাপকে সাহেবদের নীল কুঠিতে নিয়ে এক পোঁচ নীল রং মাখিয়ে কানে ফুস-ফুস কোরে মন্তর দিয়ে ছেড়ে দিলে।

"রতা-শেয়াল ছিল লাল, এখন সে নীল হয়ে বনে ফিরে এসে মহা হৈচৈ বাধিয়ে দিলে—রাজা-উজির মেরে বেড়াতে আরম্ভ করলে! শেয়াল বোলে তাকে আর চেনাই যায় না! মামা ভোম্বলদাস পর্য্যন্ত ভয়ে তাকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে পথ পান না। কৈলাস-পর্ব্বত থেকে পশুপতি ভোম্বলদাসের বোকামোর খবর পেয়ে এই নতুন রাজাকে রাজ্য শাসন করতে পাঠিয়েছেন—এই কথাই বনে-বনে রাষ্ট্র হয়ে গেল।

'মামা একে মামীর শোকে অস্থির, তার উপর সিংহাসন হারিয়ে পাগলের মতো হলেন। এদিকে রতা, যে একদিন মামার চাকর ছিল, মাইনের জন্যে দু-বেলা ভাল্লুক মন্ত্রীর কাছে ধন্না দিতো, মারের ভয়ে বাঘা-কোটালের বাড়ী এঁটো-কাঁটা ফেলে ত্রি-সন্ধ্যা খেটে মরতো, বকা-ধার্ম্মিকের জন্য মাছ কুটে-কুটে হাত খইয়ে ফেলতো—সেই হলো হুকুম হাকামের কর্ত্তা। সবার যে কি দুঃখে দিন যাচ্ছে বলা যায় না, কিন্তু রাঙা রতা —সে রং বদ্‌লে বেশ সুখেই আছে। সবাই তার কাছে জোড়-হস্ত!

"সেই সময় রতা যদি আরো দিন-কতক নিজের বুদ্ধি না প্রকাশ কোরে তার পণ্ডিত ছেলেটার কথা-মতো চল্‌তো তবে কোনো গোলই হতো না। কিন্তু সিংহাসন পেয়ে রতার মাথা গরম হয়ে গেল। সেই সঙ্গে যেটুকু বুদ্ধি মগজে ছিল, সেটুকুও তার গায়ের রঙের মতো বদ্‌লে বাঁকা-চোরা উল্টো-পাল্টা হয়ে রতা যা-তা করতে আরম্ভ করলে।

"সব জানোয়ারের ল্যাজ থাকবে, কেবল তারই থাকবে না—এটা তার আর সইচে না! তার পণ্ডিত ছেলের উপরই রাগটা বেশী। তারই কথাতেই তো সে ল্যাজ দিয়ে প্রাণ নিয়ে সরে ছিল। এখনো সেই ল্যাজ ফাঁসি-কাঠে ঝুলচে! সেটাকে নামিয়ে এনে নিজের পিঠে যে জোড়া দেবে তারও উপায় ছেলেটা রাখেনি!—নীল গায়ে লাল ল্যাজ মেলানো শক্ত! যত দোষ হলো শেয়াল পণ্ডিতের আর সেই অপরাধে সে রাজ্যের জানোয়ারদের ল্যাজ কেটে ফেলবার হুকুম দিয়ে বসলো।

"জানোয়ারের দলে সোরগোল পড়ে গেল। সিংহ বেঁকে

বসলেন—কিছুতেই ল্যাজ দেব না! দেখা-দেখি বাঘও গোঁ ধরলে,—ল্যাজ আপ্‌সে বল্লে—যাক্ প্রাণ, থাক ল্যাজ! মোষও চোখ রাঙিয়ে বাঘের কথায় সায় দিলে। ভাল্লুকের ল্যাজ ছিল না বল্লেই হয়, সে বল্লে—রাজার হুকুম না মানলে নয়, মুশকিল! বানর তাকে দাবড়ি দিয়ে বোলে উঠলো—তোমার চাকরি বজায় রাখতে ল্যাজ কাটতে চাও কাটো, কিন্তু আমরা তোমায় এক-ঘরে করব, মনে থাকে যেন! ভাল্লুক ভয়ে চুপ হয়ে গেল। ভাল্লুক যখন চুপ করলেন, তখন খরগোস, কচ্ছপ, হরিণ—যাদের ল্যাজ নজরেই পড়ে না তারা আর উচ্চবাচ্যই করতে পারলে না।



"এদিকে রাজার ইস্তাহার জারি হলো—পয়লা তারিখে শেয়ালদের, দোসরা তারিখে সিংহ-বাঘ এমনি সব হোমরা-চোমরাদের, তেসরা তারিখে গোরু-গাধা-মোষ এদের, চৌঠো বাকি সব প্রজার ল্যাজ কাটা চাই, নচেৎ প্রাণদণ্ড!

"সব জানোয়ার ধর্ম্মঘট কোরে এমন রাজার বন ছেড়ে মানুষের রাজত্বে গিয়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় থাকবার মতলব করেছে, এমন সময় শেয়াল পণ্ডিত নাপিত-ধূর্ত্তর পাঠশালা থেকে নাকুর বদলে নরুণ, নরুণের বদলে হাঁড়ি, হাঁড়ির বদলে ধুচুনি আর ধুচুনির বদলে বাড়ীর গিন্নী কেমন কোরে আনতে হয়, সেই বুদ্ধি শিখে, বৌ-সঙ্গে ধুচুনি মাথায় ঢোল পিটতে-পিটতে বনে এসে হাজির। সব জানোয়ার তার

বুদ্ধির তারিফ কোরে ল্যাজ বাঁচাবার একটা উপায় করতে তাঁকে ধরে পড়লো।

"পণ্ডিত শুনলেন প্রথমেই শেয়ালদের ল্যাজ নামাবার হুকুম হয়েছে। তিনি খানিক গম্ভীর হয়ে থেকে বল্লেন—তোমরা সবাই নিশ্চিন্ত থাক, এর উপায় আমি করবো। পয়লা তারিখে সব শেয়াল আর জন্তু জানোয়ার যে যেখানে আছ, ঠিক সময়ে রাজসভায় হাজির হবে ;—এদিক-ওদিক না হয়! রাজা যখন বলবেন—ল্যাজকাটো। অমনি সবাই নিজের ল্যাজ দাঁতে চেপে ধোরে সিংহাসনের দিকে মুখ ফেরাবে, আর যা করতে হয়, আমি করবো। কিন্তু কথা যেন ঠিক থাকে। আর পয়লা তারিখে ছেলে-বুড়ো সব শেয়ালের এক "রা" হওয়া চাই। না হলে সব মাটি!

"সবাইকে বুদ্ধি দিয়ে শেয়াল পণ্ডিত বৌ নিয়ে ঘরে যান, এ দিকে ভোম্বলদাস, বাঘ, ভাল্লুক এরা আনন্দ করছে ; গাধা আর গোরু এরা ঘাড় নেড়ে বলাবলি করতে লাগলো—ভাই শেয়াল পণ্ডিতের যুক্তি তো ভালো বোধ হয় না। দাঁতে তো লেজ কামড়ে ধরলেম, সেই সময় রাজা যদি এক হুঙ্কার ছাড়েন, তবে দাঁত কপাটি তো লেগে বসে আছে! তখন যদি ল্যাজের গোড়ায় দাঁত একটু চেপে বসে তবে ল্যাজ খসে না পড়ে যায়। আমাদের তো ভাই ভালো বোধ হচ্ছে না। শেষে ঠকতে না হয়! ভোম্বলদাস দুজনকে ধমকে দিয়ে বিদায় কোরে দিলেন। তারা দুই জনে দল ছাড়া হয়ে এক জন গেল গোয়াল-ঘরে বাঁধা পড়তে, এক জন গেল ধোবার বাড়ী মোট বইতে।

"পয়লা তারিখে নল বনে নীল রাজা কাটা ল্যাজে জরির ফুঁপি আর ময়ূরের পালকের এক রাখী বেঁধে গোম্‌সা মুখ

করে ল্যাজ ভাসান্ দেখবার জন্য ঘাড় উঁচু কোরে রাঙা মাটির সিংহাসনে উঠে বসলেন। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। নদীর জলে যেন



রক্তের ঢেউ খেলচে। ধারে-ধারে শর বন-গুলোর মধ্যে জানো-য়ারেরা গুঁড়ি মেরে বসে রাজার দিকে চেয়ে রয়েছে—কখন কি হুকুম হয়! এমন সময়ে শেয়াল পণ্ডিত রাজ্যের খ্যাঁকশেয়াল নিয়ে সভায় উপস্থিত হয়ে হাত জোড় কোরে দাঁড়ালেন। নীল রাজা এ পর্য্যন্ত কারো সঙ্গে কথা বলেন নি, পাছে মুখ খুললে শেয়ালের রা ধরা পড়ে যায়। ইশারায় শুধোলেন—কি হলো? পণ্ডিত নিজের ঝাঁটা ল্যাজ নিশেনের মতো আকাশে তুলে হেঁকে বললেন—হুয়া! অমনি চারিদিকে শেয়ালের পাল ডেকে উঠলো—হুয়া হুয়া! রাজা তাদের ল্যাজের দিকে আঙুল দেখিয়ে ইশারা করলেন—কি হুয়া? —কিছুই হয় নি! কিন্তু শেয়াল পণ্ডিত কেবল বলতে লাগলো —হুয়া হুয়া হুয়া উচ্চা হুয়া উচ্চা হুয়া!

"এক শেয়াল ডাকলে সব শেয়ালকেই ডাকতে হবে——এটা বিধাতার নিয়ম। ডাকবার জন্যে রতার প্রাণ আই-ঢাই করতে লাগলো, তবু সে দু-হাতে মুখ চেপে বসে রইলো দেখে শেয়াল পণ্ডিত দল-বলকে ইশারা করলেন। ঠিক সেই সময় সূর্য্যও অস্ত গেলেন। অন্ধকারে শেয়ালের পাল চারিদিক থেকে ডেকে উঠলো—হুয়া হুয়া হোতা হুয়া হোতা হুয়া! রতার মুখ আর বন্ধ থাকলো না। সে মোটা

গলায় চেঁচিয়ে উঠলো—ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া ? না হুয়া না হুয়া।

"আরে শেয়াল !"—বোলে ভোম্বলদাস অমনি তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে এক থাপ্পড়ে রতাকে সিংহাসন থেকে জলে ফেললেন ! সেখান থেকে বাঘ তাকে মুখে কোরে তুলে দেখালে—নীল রঙ ধুয়ে বেরিয়েছে—ল্যাজ কাটা রতা শেয়াল, রাজ-মিস্ত্রি !

"সেই অবধি শেয়াল পণ্ডিতকে মামা সভা-পণ্ডিত কোরে রাখলেন আর তারই বুদ্ধিতে চলতে লাগলেন। ছিল সে রাজ মজুরের ছেলে, হলো সে রাজার প্রধান মন্ত্রী। অহঙ্কারে আর মাটিতে তার পা পড়ে না। তারপর বুদ্ধির জোরে সে কি না করলে ? তার বাড়ী হলো, ঘর হলো—মামার দৌলতে তার সব হলো। এখন সেই মামাকেই সে নিজের গড়ে নিয়ে বন্ধ করবার যোগাড় করেছে—টিকটিকি এই খবর আমাকে দিয়ে গেল। কোন্ দিন সে মামাকে সারিয়ে-সুরিয়ে ফুস্‌লে-ফাসলে নিয়ে আমারই বা সিংহাসন আবার কেড়ে নিতে আসে।"



সিংহরাজের রাজ্যাভিষেক

সিংহরাজ বললেন,—"কোন্‌দিন বা শেয়াল পণ্ডিত ভোম্বলদাস মামাকে নিয়ে আমারই সিংহাসন আবার কেড়ে নিতে আসে !"

ভাল্লুক ঘাড় নেড়ে বললেন,—"হতে পারে।"

বাঘ ল্যাজ আপ্‌সে বললে—"এখনি এর একটা বিহিত করা চাই।"

গজপতি বল্লেন— "এমন কেউ নেই ঐ পাজি শেয়ালটা যাকে অপমান না করেছে।"

মোষ চোখ রাঙিয়ে বল্লেন—"ওটা বিষম ঠক !"

ছোট ছোট জানোয়ার, তারা বলে উঠলো—"দোহাই মহারাজ, ওর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ওর জ্বালায় ঘর করা দায় হয়েছে।"

সিংহ সবাইকে অভয় দিয়ে বল্লেন,—"ভয় নেই। ওকে আমি রীতিমতো শাস্তি দেব। আসছে মাসে মামীর শ্রাদ্ধ,

সেই দিনই এখানে আনাচ্ছি ; তারপর বিচার কোরে দেখা যাবে কি করা যায়। এখন তোমাদের ওর নামে যদি কিছু নালিশ থাকে প্রকাশ কোরে বলতে পার ; সজারু সব লিখে নেবেন। আমি তো শেয়াল পণ্ডিতের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেশছাড়া করব কিন্তু তোমাদেরও আমার জন্যে কিছু তো করা চাই। মামা তো কৈলাসে গেলেই শীতে মরবেন জানা কথা, কেবল শেয়াল পণ্ডিতই তাঁকে বুদ্ধি দিয়ে কৈলাস যেতে দিচ্ছে না। এখন মামা শুনছি তপস্যা কোরে নতুন শরীর পেয়েছেন। শেয়াল তাঁকে রোজ একটা কোরে পাঁঠার রক্ত খাইয়ে বেশ মোটা-সোটা করে আবার যে দিন রাজ্যে ফিরিয়ে আনবে, সে দিন আমাকে তো সিংহাসন ছেড়ে নামতেই হবে, তোমাদেরও যে কারু ল্যাজ সে রাখবে তা বোধ হয় না। তাঁর নামে তোমরা যে সব নালিশ রুজু করতে চলেছ, এ খবর তাঁর কাছে পোঁছবে। অতএব তোমাদের উচিত যে আজই আমাকে মামার রাজ্যে অভিষেক করা। আমার রাজ্য হলে আমি যা বিচার করব, তার উপর আর মামা এলেও কথা চলবে না—মামার বাবা এলেও নয়!"

এই বোলে সিংহ হুঙ্কার ছেড়ে চারিদিক চাইলেন ; সব জানোয়ার ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে এক সঙ্গে ল্যাজ তুলে জানালে —"তাই হোক। এখনি আপনাকে অভিষেক করা হোক! বুড়ো ভোম্বলদাসকে চাইনে আমরা—সে তার পণ্ডিতের বুদ্ধিতে চলতে চায় চলুক ; আমরা গায়ের জোরে সিংহকে রাজা করবো—জোর যার মুলুক তার।"

সিংহরাজ মামার মালখানা খুলে রাজমুকুট, রাজদণ্ড, শ্বেত-

ছত্র, শ্বেতচামর আনতে মন্ত্রীকে হুকুম করলেন। ছুঁচোর কাছে মালখানার চাবি থাকতো, সে এসে নিবেদন করলে, পণ্ডিত মশাই যাবার একহপ্তা আগে বুড়ো রাজার হুকুম-নামা দেখিয়ে মালখানার চাবি তার হাত থেকে নিয়েছেন; সে চাবি তার কাছে এ পর্য্যন্ত ফিরে আসে নি। সিংহ এক থাপ্পড়ে ছুঁচোকে যমালয় পাঠান আর কি, এমন সময় ভাল্লুক-মন্ত্রী সিংহকে রাজা না হতেই অবিচার কোরে ছুঁচো-মেরে হাতে-গন্ধ করে বসতে নিষেধ করলেন।

কিন্তু মালখানার দরজা না খুললে তো কাজ-কর্ম্ম চলে না। সিংহ হুকুম দিলেন,—"ভাঙো দরজা।"

দরজা গেঁথেছিল রতা-শেয়াল, হাতী হয়েছিল ফোগলা—তিনি সে কাজে আর এগুলেন না। মোষ গেল, ষাঁড় গেল—সবাই শিং বেঁকিলে ফিরে এলো। বুনো শুয়োর তার ছিল সোজা ছুঁচোলো দাঁত, দরজায় ধাক্কা খেয়ে অর্দ্ধচন্দ্রের মতো বেঁকে গেল। গণ্ডারেরও ঐ দশা। এদের মধ্যে কেউ দাঁতে কোরে, কেউ শিঙে কোরে না তুলেছেন, না ভেঙেছেন এমন নেই, কিন্তু কি গাঁথুনিই গেঁথেছিল রতা—দরজা খুললো না।

এ দিকে এই খবর যেখানে ভোম্বলদাস শেয়াল পণ্ডিতের সঙ্গে বসে শাস্ত্র-আলাপ করছেন সেখানে এসে কেউ জানিয়ে গেল। মামা তো হেসেই অস্থির; শেয়ালকে বল্লেন—"ওহে পণ্ডিত, চাবিটা ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দাও—আরো কিছু মজা হোক।"

শেয়াল বল্লেন,—"চাবিটা মহারাজ আমি গিয়ে দিয়ে আসি। নতুন রাজা খুশী হবেন—কি বলেন?"

ভোম্বলদাস চোখ-মটকে বল্লেন—"যাও, কিন্তু ভাগ্নে যখন

উত্তম, মধ্যম পুরস্কার হুকুম দেবেন, সে সময় ল্যাজ তুলে তাঁকে আশীর্ব্বাদ কোরে চটপট ফিরে আসতে ভুলো না।”

শেয়াল যদি গেল বিদায় পেয়ে তো মশা এলো ভোম্বলদাসের কানের কাছে ভন্ ভন্ করতে। মশা মিহি স্বরে কানের কাছে বল্লে,—“মহারাজ!”

ছুঁচের মতো কথা বিঁধলো—ভোম্বলদাসের প্রাণে। তিনি মাথা নেড়ে নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—“আর মহারাজ বোলে কেন সম্বোধন কর? আমার যথাসর্ব্বস্ব গেছে পরের হাতে!”

মশা আর একবার এগিয়ে এসে বল্লে—“ধন-দৌলত সকলই মজুদ। হুকুম করেন নির্ভয়ে বলতে তো বলি। ঐ যে দেখেন উই ঢিবি—”

ভোম্বলদাস ল্যাজ আপসে উঠে বল্লেন,—“উই ঢিবি কি বল? ওটা না কৈলাস-পর্ব্বত।”

ভোম্বলদাসের হুমকি শুনে মশা তো ভয়ে কম্পমান। তার মিহি স্বর আরো মিহি হয়ে গেল। সে কেবলই পিঁপিঁ কোরে কি বলতে লাগলো কিছুই বোঝা গেল না। ভোম্বলদাস তখন মশাকে অভয় দিয়ে বল্লেন—“বোলে চল।”

মশার তখন কথা ফুটলো। সে যা বললো ভোম্বলদাসকে খুব ছোট-ছোট করে তা শোনা মাত্রই যেন হাজার ছুঁচ ফুটলো রাজার গায়ে। তিনি একবারে দন্ত কড়মড় কোরে চার থাবা দিয়ে নিজের গা আঁচড়াতে থাকলেন রাগে এমন যে নিজের ছাল-চামড়া কিছু আর রইলো না গায়ে। খেয়ে দেয়ে যেটুকু বা রক্ত হয়েছিল গায়ে তার সবটা বেরিয়ে গেল একদম! খালি রইলো হাড়-কখানার মধ্যে ধুক্‌পুক্ করতে তাঁর প্রাণটুকু।

রাজ-রক্ত মাটিতে পড়ে মাটি হয় দেখে মশার দল এসে

জুটলো চারিদিক থেকে। ভোম্বলদাসকে তারা ঘিরে রইল দিনরাত খুব সাবধানে। তাঁর গায়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে সব কড়া ওযুধ দিতে থাকলো। কেউ তারা রক্ত পরীক্ষা কোরে দেখে —ম্যালেরিয়া হলো কিনা। কেউ দেখে টাইফয়েড হলো কি কালাজ্বর ?

এমনি রক্ত শুষতে-শুষতে যখন ভোম্বলদাসের লাল চামড়া প্রায় সাদা হয়ে এসেছে সেই সময় শেয়াল পণ্ডিত ধুচুনি মাথায় ডুগ্‌ডুগি বাজাতে বাজাতে হাজির। একেবারে রাঙা চেলি-পরা বরের সাজ কিন্তু নাকটি কাটা। ভোম্বলদাস শেয়ালের সেই চেহারা দেখামাত্রই এমন অট্টহাসি হাসলেন যে তাতেই তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল ? ভাগ্নের খবর, সুন্দর-বনের কথা শুধোবার কিম্বা ভাঁড়ারঘরের চাবি ফিরে চাইবার আর সময়ই হলো না।

শেয়াল পণ্ডিত খানিক হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে একটা নটে গাছের গোড়ায় রাজ-ভাণ্ডারের চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের গর্ত্তে ঘুমতে গেল ; আর একটা ছাগল—ঠিক তেমনি ছাগল, যাদের পাঁটার জুস্ খেয়ে ভোম্বলদাস নিজের গায়ের রক্ত করেছিল—সে কোথা থেকে এসে বনের ধারে—নটে গাছটার গোড়াসুদ্দ মুড়িয়ে খেয়ে দিব্যি আরামে কৈলাস-পর্ব্বতের মতো প্রকাণ্ড উই টিবির চুড়োয় তিন লাফে গিয়ে উঠলো—

ঠিক দুক্কুর বেলা,
যখন ভূতে মারে ঢেলা।

সেখান থেকে সে শুনলে সুন্দর-বনে নতুন রাজার অভিষেকের দিনে জোড়া পাঁটা গর্দ্দান দেবার আগে তাকে ডাকাডাকি করছে ম্যা ম্যা বোলে।



ধরা পড়া

স্থান—গোবর্দ্ধন।

কাল—অকাল বাদলার সকাল।

পাত্র—শুকপাখি, ছোট্‌কু, বড়্‌কু, দুই রাখাল, গোঁসাই, মথুরেশ নেড়ানেড়ী, সভাপণ্ডিত, চোবে ও নাগরিকগণ।

প্রথম দৃশ্য

[অনেকখানি চষাক্ষেতের একধারে গোঁসাই-বাড়ীর উপর তেঁতুল গাছের সবুজ স্তূপ, তেপান্তর মাঠের পারে কুমীরের পিঠের মতো একটা পাহাড়, নীল আকাশে ঝড়ের শেষে ছেঁড়া মেঘজাল, ক্ষেতের আল আঁকড়ে একটা তুঁতগাছ—তারই কাছে দাঁড়িয়ে বড়্‌কু।]

বড়্‌কু—আরে রে ছোট্‌কু রে !

ছোট্‌কু—কি রে বড়্‌কু রে ?

বড়্‌কু—আরে দেখবি আয় ! যাস্‌ কোথা ? গরু চরাবি নে ?

(সেলেট-বই হাতে ছোট্‌কুর প্রবেশ)

ছট্‌কু—দেখবো কি, আমি পড়তে চলেছি।

বড়্‌কু—আর পড়ে না, উঠে আয় এই আলটার উপর। দেখ্‌'সে কত বড় পর্‌জাপতি।

ছোট্‌কু—কই রে কই? ধর্‌ না, সুতো বেঁধে ওড়ানো যাবে।

বড়্‌কু—খবরদার। ধর্‌বি তো মার খাবি।

ছোট্‌কু—আচ্ছা, ওড়াবো না, ওকে দাঁড়ে বসিয়ে পড়তে শেখাবো। ওরে বাস্‌ রে মস্ত একটা শুঁয়ো রয়েছে যে!

বড়্‌কু—ধর্‌গে না, দাঁড়িয়ে কেন?

ছট্‌কু—দেখছিস্‌, শুঁয়োপোকায় আর পর্‌জাপতিতে কি যেন বলাবলি করছে।

বড়্‌কু—তোর মুণ্ডু করছে। দেখছিস্‌নে পর্‌জাপতি ডিম পাড়্‌ছে আর শুঁয়োটা তুঁত-পাতা চিবোচ্ছে মচর-মচর।

ছোট্‌কু—তোর মাথা করছে। তুঁতগাছে কখনও পর্‌জাপতি ডিম পাড়ে?

বড়্‌কু—পাড়ে না তো কি? তুই তো জানিস্‌ ভারি!

ছোট্‌কু—আমি পড়েছি, পর্‌জাপতি ফুলের মধু খায় আর ফুলের মধ্যে ডিম পাড়ে—যেন সোনার গুঁড়ো।

বড়্‌কু—আর আমি কি শীত কি বর্ষা—রোদে, জলে, বনে, মাঠে, পাহাড়ে, জঙ্গলে ঘুরি, পাখি, পরজাপতি কাউকে জানতে বাকি নেই। আমি বলছি শোন্‌—ওদের ডিম হয় এতটুকু ছোট ছোট মুক্তোর মত সাদা, তা থেকে বাচ্চা বা'র হয়, গুটি-গুটি—গুটিপোকা আর শুঁয়োপোকা।

ছোট্‌কু—তার পরে?

বড়্কু—মাসখানেক বাদে এইখানে আসিস্—দেখাবো।

ছোট্কু—তখন তো ছুটি পাবো না।

বড়্কু—তবে দেখতেও পাবি নে।

ছোট্কু—বল্ না, না হয় শুনি।

বড়্কু—এ সব দেখবার জিনিস, শোনবার নয়। তুই যখন গুরুমশায়ের পায়ে তেল দিবি, তখন ঐ মাঠে গরুগুলো ছেড়ে দিয়ে এসে আমি দেখবো, সব পুটুসফুলের ডালে রং-বেরং ফুল ধরেছে, আর তারি উপরে সব—আঃ! সে যে কি চমৎকার,—তোকে কি বলবো!

ছোট্কু—চমৎকার। আমাকেও দেখাবি, বল্?

বড়্কু—যদি আসতে পারিস্, নিশ্চয় দেখাবো। আঃ, আজ কি বাতাসই বইছে। ঐ ও-মাঠে বাঁশীর ভিতর দিয়ে বাতাসটা যেন কথা বল্ছে, কি কইছে বাঁশী তা জানিস্?

ছোট্কু—বাঁশী আবার কথা বলে নাকি?

বড়্কু—বলে না? বাঁশী মনের কথা বলে।

ছোট্কু—বল্ তো দেখি, কি বলছে বাঁশী?

বড়্কু—শুন্বি শোন্—

(গান)

তোমারি প্রাণের বাঁশরী করিও,
তোমারি বুকেরি সুরে ভরিও,
মনে যে তোমারি উঠিছে গান
আমারে শিখায়ো তাহারি তান
আমারে আপন করিও
তোমারি সুরে ভরিও,
তোমারি প্রাণের বাঁশরী—

ছোট্‌কু—আমি কালই হাটে একটা বাঁশী কিনবো।

বড়্‌কু—কিনে কি করবি ?

ছোট্‌কু—বাজাতে শিখবো।

বড়্‌কু—তবেই হয়েছে! একে কেনা বাঁশী, তায় শেখা বিদ্যে! তোর বাঁশী বলবে না।

ছোট্‌কু—তবে ?

বড়্‌কু—তবে আর কি, বাঁশী কখনো কিনতে পাওয়া যায় ?

ছোট্‌কু—হাটে তো দেখি অনেক বিকোতে আসে।

বড়্‌কু—সে শুধু বাঁশ। বাজিয়ে দেখিস্‌, বাজবে না!

ছোট্‌কু—বাজাতে শিখ্‌বো।

বড়্‌কু—ওই তোর এক কথা—এ শিখবো, তা শিখ্‌বো। শিখে তো ছাই হবে, যেমন পড়া পাখি, তেমনি শেখা বাঁশী।

ছোট্‌কু—তবে ?

বড়্‌কু—তবে আর কি ? এই আমার মতো ঘাটে-আঘাটে ঘোর্‌—হয় তো কোন দিন কবে কার হারানো বাঁশী কুড়িয়ে পেয়ে যাবি, তখন দেখবি, শিখ্‌তেও হবে না—বাঁশী আপনি বাজবে।

(গান)

ওই ওপারে ও কা'র বাঁশী
আপনি বাজে,
বিনা কাজে সকাল সাঁঝে
আপনি বাজে।
হাটে বাঁশী বাটে বাঁশী
বাজ্‌ছে ও কার মোহন বাঁশী,

কোন্ পরাণের কান্না-হাসি
ভুবন জুড়ে আপনি বাজে।
গহন-বনে মোহন বাঁশী
আপনি বাজে।

ছোট্‌কু—এই রইল সেলেট-বই। আর পাঠশালার মুখো হই তো আমার নাম—

(শুকপাখির খাঁচা হাতে গোঁসাইয়ের প্রবেশ)

গোঁসাই—নাম করো, নাম পড়ো, নাম পড়ো।

শুক—নিত্যং ভজ, চিত্তং ভজ।

বড়কু—গোঁসাই চলেছেন কোথা?



গোঁসাই—চুপ্ চুপ্ শুক পড়ছে বৃন্দাবন-হাট সেরে ফিরছি।

শুক—কৃষ্ণ কোথায়? কৃষ্ণ মথুরায়।

ছোট্‌কু—ঠাকুর আপনার বাড়ীতে মথুরার রাজ-পণ্ডিত এসে বসে আছেন।

গোঁসাই—কেন, কেন, আমার বাড়ীতে কেন, আমি গরীব।

ছোট্‌কু—তা তো বলতে পারলাম না, তবে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে আটজন ভোজপুরী একটা খাঁচা নিয়ে এল।

বড় কু—বোধ হয় কোন পাখিকে পড়াতে পাঠিয়েছেন রাজা।

গোঁসাই—হতেও পারে।

ছোট কু—না গোঁসাই, আমি দেখেছি—খালি খাঁচা।

গোঁসাই—খালি খাঁচা কি জন্যে পাঠাবেন রাজা ?

ছোট কু—তা তো বলতে পারলাম না। বোধ হয় খালি খাঁচা গোঁসাইয়ের জন্যে পাঠিয়েছেন রাজা।

গোঁসাই—আরে মূর্খ, আমার জন্যে নয়, শুকের জন্যে।

ছোট কু—তা তো বলতে পারলাম না।

শুক—তা তো বলতে পারলাম না।

বড় কু—শুক কি বলে শোনেন গোঁসাই।

গোঁসাই—তোরা থাম, বল বাবা নিত্যং ভজ।

শুক—তা তো বলতে পারলাম না।

গোঁসাই—শুক আমার শ্রুতিধর, যা শোনে তাই শেখে। ওরে তোরা হরিনাম কর্‌! (দূরে কুকুর ডাকল) সর্ব্বনাশ! শুক কুকুর ডাকতে শিখলে বুঝি। ওরে তোরা নাম কর্‌—চেঁচিয়ে।

শুক—নাম কর্‌ চেঁচিয়ে।

গোঁসাই—যাক ভুলেছে। হা বাবা নাম করো চেঁচিয়ে।

বড় কু—আর আমাদের চেঁচাতে হবে না, ওই আস্‌ছে ওরা।

(নেড়ানেড়ী—গাইতে গাইতে প্রবেশ)

মন বুল্‌বুল্‌—কেন চুল্‌বুল্‌ ক'রে
বাইর পানে চাও!
বলি, থাকতে সময়, এই রসনায়
নাম পড়ে লাও, নাম করে লাও!
মন বুল্‌বুল্‌; পাবি অকূলে কূল
কেন চুল্‌বুল্‌? নাম করি লাও।

গোঁসাই—আরে রাখো তোমার চুলবুল্। পাড়ার খবর কিছু জানো ?

নেড়া—রাজ-পণ্ডিত এয়েছেন, আপনার ওহানে।

গোঁসাই—আরে তা তো শুনেছি ; কেন এসেছেন বলতে পারো ?

নেড়ী—আপনার নীলাশুককে মথুরায় নিতে।

গোঁসাই—অ্যাঁ বল কি ?

নেড়া—আপনার ঐ নীলাশুকের পড়া শুনতে মথুরাসুদ্ধ রাজাকে ধরে বসেছে।

নেড়ী—গোবর্দ্ধন-গোঁসায়ের নীলাশুককে দেখে তারা জন্ম সার্থক করবে, তাই না রাজা সভা-পণ্ডিত পাঠিয়েছেন।

গোঁসাই—শুক আমার সবে ধন নীলমণি। একে তো আমি প্রাণ ধরে সেই কংসের মথুরায় পাঠাতে পারব না।

নেড়া—সঙ্গে আটজন চোবে এসেছে, সহজে না দিলে কেড়ে নিয়ে যাবে—পাখিকে।

গোঁসাই—তাই তো, প্রাণশুককে এখন লুকোই কোথা ?

বড়্কু—খাঁচা খুলে দিন, যেখানকার শুক সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থাক, ঝোপে-ঝাড়ে।

গোঁসাই—তাহলে শুক কি আমার আর ফিরবে ?

বড়্কু—ঠিক ফিরবে, ছোলা কলার লোভে।

গোঁসাই—কিন্তু পড়া যে ভুলে যাবে, তার কি ?

বড়্কু—পড়ার কথা ছোট্কু জানে ওকে শুধোন।

গোঁসাই—না প্রাণশুককে নিয়ে দেশান্তরি হই।

বড়্কু—শুকের গুণের কথা দেশ-বিদেশে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। যেখানে যাবেন, রাজার চর গিয়ে ধরবে। আমার বুদ্ধি নিন,

শুককে ছেড়ে দিন, ওর ইচ্ছে হয়—মথুরায় যাক, নয় তো যাক—মক্কায়।

গোঁসাই—চুপ চুপ, মক্কা যাবার নামটি কোরো না শুকের কাছে, ও যা শোনে তাই শেখে। নাম করো, নাম করো।

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

নাগরিক—গোঁসাই, ভাল ত ?

গোঁসাই—এই যে নাম করতে করতে তোমরা এসেছ, তবে সংবাদ কি ?

নাগরিক—সংবাদ বড় শক্ত।

২ না—জোর তলব এসেছে।

১ না—দূত এসেছে, শুককে নিতে।

গোঁসাই—কি বললে, প্রাণশুককে নিয়ে যাবে—মথুরায় ? তা তো দেবো না।

নাগরিক—ঐ আসছে দূত, আট আট চোবে সঙ্গে।

গোঁসাই—এ যেন অক্রূর এলেন প্রাণকৃষ্ণকে নিতে।

(সভা-পণ্ডিতের প্রবেশ)

সভা—গোঁসাই শুনেছেন বোধ হয়, রাজার আদেশ ?

গোঁসাই—দেব না, প্রাণশুককে আমরা ছেড়ে দেব না।

সকলে—

(গান)

যেতে দেবো না উড়ে,
ও আমার পড়া-পাখি
মথুরারি রাজপুরে।
ও যেতে দেবো না দূরে।

রাখবো কাছাকাছি,
ভালবাসার কাছি
বাঁধবো কষে জোরে
আমার ঘরের দোরে—
দেখবো কেমন কোরে
পাখি লয় চোরে।

সভা—সহজে না যেতে দেন তো—

চোবে—জোর করে এই সোনার খাঁচায় ভরে নিয়ে যাবো।

গোঁসাই—ইস্ এ তো খাঁচা নয়, যেন সোনার একটা রথ। তা—তাহলে আপনারা দেখছি নেহাতই আমার প্রাণশুককে ঐ সোনার রথে করে মথুরায় নিয়ে যাবেন।

সভা—শুধু নিয়ে যাওয়া নয়, সোনার রথটাসুদ্ধু শুককে আবার গোঁসায়ের ঘরে পোঁছে দেবার হুকুম পেয়েছি।

নাগরিক—রাজা কি শুকের মুখে নাম-কীর্ত্তন শোনবার জন্যে বড়ই ব্যাকুল হয়েছেন?

গোঁসাই—দেখতে পাচ্ছ না? সোনার খাঁচাটা কি ওমনি এসেছে?

নাগরিক—তাহলে তো পাঠাতে হয় শুককে!

গোঁসাই—কিন্তু প্রাণশুক কখনো আমা-ছাড়া হয়ে থাকে নি। তাকে একা মথুরা পাঠাতে যে ভয় হয়।

সভা—তা হলে আপনি চলুন।

গোঁসাই—বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং আমার যে নড়বার যো নেই, গুরুর আদেশ অমান্য করা হয় তা হলে।

সভা—তবে লোক দিন।

গোঁসাই—তাই তো কাকে পাঠাই তেমন লোক—

নাগরিক—লোকের আবার অভাব, রাজসভায় যাবার নাম শুনলে কত লোক এখনি—

গোঁসাই—তোমার যাবার ইচ্ছে আছে নাকি ?

নাগরিক—গেলেও হয়। আমার পড়া-পাখিটাও না হয় সঙ্গে নেবো, যদি রাজার চোখে লেগে যায়।

গোঁসাই—নরাধম, তোমার নরকের ভয় নেই ? গুরুর আদেশ ঠেলে বৃন্দাবন ছাড়তে চাও!

নাগরিক—তবে তো কারু যাওয়া হয় না!

সকলে—উপায় কি ?

বড়্‌কু—আমার গুরুর আদেশ তো নেই—তবে আমিই যাই।

নাগরিক—রাখাল তুই গরু চরাতেই জানিস, পাখি পড়াবার কে, যে যেতে চাস্‌ রাজসভায় ? পাষণ্ড!

বড়্‌কু—তবে ছোট্‌কু যাক, ও পড়া-রাখাল, পড়া-পাখিকে ঠিক্ রাখ্‌বে।

সভা—সেই ভাল, এস বাপু, পাখি নিয়ে এস, আর দেরী নয়, আমি অগ্রসর হয়ে রাজাকে খবর দি।

সকলে—চলুন, আমরা শুককে পৌঁছে দিই—ঘাট পর্য্যন্ত।

ছোট্‌কু—ওরে ভাই বড়্‌কু পড়্‌তে শেখার আদর দেখ্‌চিস, সোনার রথ এসেছে। আমাকে আর শুককে নিতে!

বড়্‌কু—তোর বিদ্যের দৌড় যা—তাতে তোকে রাজা হয় তো পুষেই ফেলে বা—নে এগিয়ে চল্—খাঁচা নিয়ে।

গোঁসাই—দেখো, ছোট্‌কু, প্রাণশুককে নিয়ে যাচ্ছ, রোজ এক হাজার কৃষ্ণনাম পড়িও, আর দেখো অযত্ন কোরো না। শুককে আমার তোমাদের হাতে সঁপে দিলেম, ভালয় ভালয় ফিরিয়ে এনো বুঝলে ? (রোদন)

বড়কু—কাঁদেন কেন, রাজা শুককে ফিরিয়ে দেন ভাল, নয় তো দোসরা শুক নিয়ে পড়িয়ে নেবেন!

গোঁসাই—অমন কথা বোলো না, এই লীলাশুককে আমি প্রাণ দিয়ে মানুষ করেছি, না ফিরে পেলে মারা যাব।

সভা—ওহে, চল হে চল।

গোঁসাই—চলেন চলেন, ধর না হে অক্রুর সংবাদ—

সকলে—ধর হে ধর—

(গান)

মনসুখে প্রাণশুকে
লয়ে চল মথুরায়,
কে হে তুমি মথুরায়।
বড় সাধের পড়া-পাখি আমার গো,
তারে ছেড়ে প্রাণ বল কেমনে রাখি।
বৃন্দাবন শূন্য করে পড়া-পাখি পালিয়ে যায়,
তোরা ধরে রাখ, ধরে রাখ, মথুরায়।
হৃদি-পিঞ্জরের পোষাপাখি ধরে রাখ,
বেঁধে রাখ, শিকল দিয়ে বেঁধে রাখ,
পড়া দিয়ে ভুলিয়ে রাখ।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাজসভা—চোবেগণের মধ্যে মথুরেশ। দূরে রাজার চিড়িয়াখানায় নানা পাখি কিচ-মিচ করছে।]

রাজা—কই শুক এখনো এলেন না।

১—মহারাজ, দেখে আস্‌বো কি?

রাজা—বড় বিলম্ব হচ্ছে না ?

২—হচ্ছে বটে।

রাজা—চিড়িয়াখানার সর্দার কোথা গেল ? বাইরে পাখিগুলো বিষম গোল করছে, ওদের থামাক না।

সর্দ্দার—মহারাজ, ওদের খোরাক নিয়মিত সময়ের চেয়ে আগেই দিয়েছি, তবে যে কেন গোল করছে, বুঝলেম না।

১—বোধ হয় নৃপতিকে আশীর্ব্বাদ করছে।

২—না হে, দেখচো না, যেন কপ্‌চাচ্ছে, ওদের পড়ার সাধ হয়েছে বোধ হয়।

সর্দ্দার—তা হলে ওদের পড়াবার জন্যে একজন তো গুরু দরকার—আমার ছেলেকে—

১—ওরা ক্ষিদের জ্বালায় আরো চেঁচাবে।

রাজা—তোমার ছেলেটিকে বল, পাখির খোরাক থেকে যেটা সে নিজের জন্যে রেখেছে, সেটা পাখিগুলোকে এনে দিক্, না হলে—

সর্দ্দার—তা হলে আমাদের উপায়।

রাজা—উপায় পরে ঠাউরো, আপাততঃ যা বলি তাই করো, শুক এখনি আস্‌বেন, গোল না হয়।

সর্দ্দার—ভ্যালা এক নীলাশুকের আবির্ভাব হলো।

রাজা—কি বল্লে ?

সর্দ্দার—আজ্ঞে আমার ভয় হচ্ছে, শুক যদি পথের মধ্যে থেকে পলায়ন করেন—

রাজা—সোনার খাঁচা, রুপোর তালা, তামার চাবি—এ থেকে পলায়ন কখনো সম্ভব !

১—অসম্ভব।

২—ঐ বুঝি আসছেন—

(সভা-পণ্ডিতের প্রবেশ)

রাজা—কই, শুক কই ?

সভা—আজ্ঞে—

রাজা—আজ্ঞে কি, শুন্‌তে পাওনি ?—শুক কই ?

সভা—আজ্ঞে তিনি—

রাজা—সুখে এসেছেন তো ?

সভা—সুখেই এসেছেন, কিন্তু শুক মহারাজ—

সর্দ্দার—শুক মহারাজের সভায় আস্‌তে কিন্তু করার কারণ—

সভা—কিছু অসুস্থ আছেন বোধ হল ; ভাল পড়্‌ছেন না।

রাজা—বলো কি ! খেতে দিয়েছিলে ?

সভা—যথেষ্ট পরিমাণে, কিন্তু—

রাজা—বৈদ্যকে দেখালে না কেন ?

সভা—আজ্ঞে তিনি শকুন্তলা-চূর্ণ আর বিহঙ্গম-বটিকা একসঙ্গে মেড়ে খাইয়েছেন, কিন্তু কোনো ফল হয় নি।

রাজা—তবে তিনি বলেন কি ?

সভা—আজ্ঞে তিনি বলেন, এ রোগের চিকিৎসা নেই।

রাজা—তবে বৈদ্যকে বোলো, এবার থেকে তাঁর চিঁড়ে মুড়কিও নেই।

১—সবাই শুকের পড়া শুন্‌লে, আর আমরাই বাদ পড়লেম ! এ তো বড় খারাপ কথা হলো !

রাজা—বৈদ্য কি বলেন ?—শুক মরবেন না কি ?

সভা—আজ্ঞে না—মরবেন না, কিন্তু তিনি আর পড়্‌বেনও না।

রাজা—হেঁয়ালি রাখো, সোজা কথায় কি হয়েছে বলে ফেল।

সভা—আজ্ঞে মহারাজ, নৌকোতে আস্‌তে শুক কৃষ্ণনাম ভুলে দাঁড়ি-মাঝিদের বুলি বল্‌ছে।

রাজা—যাক্ তবে উপায় নেই, শুককে ফিরে পাঠাও। সোনার খাঁচাটা যেন পাঠিও না।

সভা—আজ্ঞে মহারাজ, গোঁসাই তা হলে যে—

রাজা—আরে গোঁসাই দুঃখিত হলেন তো আমার কি, দাঁড়ি-মাঝিদের বুলি-পড়া শুকের জন্যে তো সোনার খাঁচা গড়াই নি—

১—সমস্‌কৃৎ-তে পড়্‌বে—তবে তো বলি, শুক্।

২—ফার্সি, উর্দ্দু, ইঞ্জিরি বল্লেও না হয়·কথা ছিল।

রাজা—মাঝির কথা—চলতি বুলি—ছোঃ! এখনি শুককে বিদায় করো, না হলে আমার চিড়িয়াখানাসুদ্ধু পাখি এই পড়্‌বে।

সভা—মহারাজের যা ইচ্ছা।

তৃতীয় দৃশ্য

[বৃন্দাবনের পথ,—শুক লইয়া ছোট্‌কু বড়্‌কু।]

ছোট্‌কু—আমি পারবো না, তুই গিয়ে পাখিটা ফিরিয়ে দে—গোঁসাই চট্‌বেন।

বড়্‌কু—চট্‌লেই হল! পড়া-পাখি যা শুনেছে তাই শিখেছে। যে নিজের বোল ভুলতে পারে, হরিবোলও ভুলতে তার বেশি দেরী হয় না—শেখা বই তো নয়!

ছোট্‌কু—ওই দেখ, গোঁসাই কীর্ত্তন করতে করতে এই দিকে আসছেন, শুন্‌ছিস্ খোলের আওয়াজ!

বড়্‌কু—এই বেলা পাখিটাকে ছেড়ে দে, ও স্বস্থানে প্রস্থান করুক, না হলে ওর কপালে দুঃখ আছে।

ছোট্‌কু—গোঁসাইকে কি বলে প্রবোধ দেবো ?

বড়্‌কু—সে ভার আমার—

ছোট্‌কু—তবে—

বড়্‌কু—চট্‌ ক'রে খাঁচাটা খোল্‌—বস্‌ !

(সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গোঁসাই ও দলবল)

(গান)

আমার পরবাসী প্রাণপাখি পরভাতে ঘরে লইনু,
ও সে পরবাসী ঘরে আলো,—যার লাগি দুঃখ পাইনু,
আহা কি আনন্দ আজু রে সই,
কি আনন্দ ভেল।
হারা-পাখি পড়া নিতে
পিঞ্জরাতে এল।

(আলুথালু বেশে গোঁসায়ের প্রবেশ)

গোঁসাই—কই, কই আমার শুক কই ?

সকলে—প্রাণশুক কই, পড়া-শুক কই ?

বড়্‌কু—এই নিন খাঁচা—

সকলে—দেখি-দেখি, এ যে শূন্য খাঁচা !—

গোঁসাই—শুক নেই !

সকলে—বৃন্দাবন শূন্য করে গেলেন—

গোঁসাই—হায় হায় প্রাণপাখি পালিয়ে গেল !

বড়্‌কু—আজ্ঞে পালান নি, ঘাটে নেমে আমাকে বল্লেন যে—

গোঁসাই—বলো-বলো, কি বল্লেন—আমাদের প্রাণশুক।

বড়্‌কু—বল্লেন যে, দেখ্‌ বড়্‌কু এতদিন ধরে নিজেই পড়্‌তে শিখলেম, কাউকে তো পড়ালুম না, তাই আমার ইচ্ছে হয়েছে,

দেশ বিদেশে যত বনের পাখি, তাদের পড়িয়ে বেড়াই, তুই খাঁচা খুলে আমায় ছেড়ে দে। আমি বলি, বাস্ রে সে কি হয়, তুমি না গেলে গিরি-গোবর্দ্ধনে কেউ কি বাঁচবে ?

গোঁসাই—তাতে শুক কি বল্লেন ?

বড়্কু—বল্লেন, আচ্ছা গিরি-গোবর্দ্ধনেই সবাইকে পড়িয়ে বেড়াব। আমি আর কি বলি, খাঁচা খুলে দিলুম, আর তিনি—

সকলে—বলো-বলো, তিনি কোন্‌দিকে গেলেন ?

বড়্কু—প্রথমে তিনি তুঁতগাছে গিয়ে দুটো তুঁতফল খেলেন, তারপর ঐ তেঁতুল গাছটায় উড়ে বস্‌লেন।

গোঁসাই—অ্যাঁ যে শুক ক্ষীর-সর-নবনী না হলে খেত না, সে এখন তুঁতফল খেয়ে ক্ষুধা মেটালে, হা কপাল!

বড়্কু—আজ্ঞে দেখলুম, বেশ ফুর্ত্তির সঙ্গে ফল দুটো তিনি খেয়ে নিলেন।

গোঁসাই—ওহে তেঁতুলতলী চল, শুককে ধরে আনি, দাও দাও খাঁচাটা, এস না হে, দাঁড়িয়ে কেন সকলে ?

সকলে—ধর হে, কীর্ত্তন ধর—

গোঁসাই—না না, শুক ডরাবে, তোমরা থাকো, আমিই যাচ্ছি।

[প্রস্থান

১—ও হে দেখতো, দেখতো—

২—দেখবো কি ?

১—আ রে দেখ না, গোঁসাই—

৩—ও আর তো দেখতে হবে না, আমি এখান থেকেই বলে দিচ্ছি, গোঁসাই কি কর্‌ছেন! গোঁসাই এখন বৃন্দাবনের আর

গিরি-গোবর্দ্ধনের তরুলতাদের শুধিয়ে বেড়াচ্ছেন—কেউ তারা শুক্‌কে দেখেছে কি না?

বল বল তরুলতা,
বঁধু আমার গেলেন কোথা?
কোথা বা সে মধুপুরী?

১—বল ওহে সবজান্তা ভাই, এখন একবার পদাঙ্ক-দূত হয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখ তো, গোঁসাই পাখিটা ধরলেন, না পালালো।

৩—পাখি তো হেঁটে পালায়নি যে পদাঙ্ক ধরে খোঁজ করবো—

আকাশের পাখি বাতাসে মিশালো
খুঁজে মরি তারে সখী যথাতথা,
আমার আকাশের পাখি আকাশ-কুসুম-
সম, তার লাগি হাঁটাহাঁটি বৃথা।

১—তবু একবার পাখিটা ধরা পড়লো না?

২—কেন, পাখিটার ওপর তোমার টাক আছে না কি?

১—উড়ো-পাখি যে ধরে তার।

৩—তা হলে তো আমারো গেলে হয়—

সকলে—আমারো—আমারো।

গোঁসাই—(নেপথ্যে) ধরেছি, ধরেছি।

সকলে—(তারস্বরে) ধরেছেন! ধরেছেন!

ছোট্‌কু—মরেছে! পাখিটার লোভ বেজায়, এখন আবার পড়ুন খাঁচায়।

বড়্‌কু—কিন্তু এবার পড়লে ওর যে কি হবে তাই ভাব্‌ছি।

খাঁচা হাতে গোঁসাই এলেন।

(গান)

ধরেছি এক পরাণ পাখি
বাঁশের খাঁচায় কুঞ্জবনে,
ও তার নামটি কে জানে।
ও সে খায় দায় আর নানা কথা কয়
নামটি কে জানে।
ও সে দাঁড়ে বসে বসে
কষে কপ্‌চায় ; পড়তে সে জানে।
ও সে কালো পাখি—
কালো রং তার, কালা মুখখানি।
তাহে রাঙা দুটি চোঁচ
হেরিয়া লাবনী ভুলল অবনী
করিছে ফাঁপরি খোঁজ।

সকলে—গোঁসাই! পাখিতো ধরলেন, এখন ওর পড়া একবার আমাদের শুনিয়ে দিন, শ্রীমুখের কথা কতদিন শুনি নি।

বড়্‌কু—(চুপি চুপি) ওরে ছোট্‌কু এই বেলা আড়ালে চল, পাখি পড়্‌বে।

[প্রস্থান

গোঁসাই—একবার পড়ো তো বাপধন!

সকলে—পড়ো পড়ো।

শুক—একটু মোরগের ঝোল দেও চাচা।

সকলে—একি! একি!

শুক—(মুর্গি ডাকল) কু-ক্কু-কু।

গোঁসাই—হা রাম! একি হল! কৃষ্ণ বলো কৃষ্ণ বলো!

শুক—ক! কঃ ক?

সকলে—এ যে রামপাখি ডাকে!

শুক—বলি, রহিম চাচা, দুটো কাঁচা প্যাঁজ দেও দিহিনি।

গোঁসাই—প্যাঁজও হয়েছে, সর্ব্বনাশ! এখন প্রাণ শুককে নিয়ে করি কি?

সকলে—কি আর করবেন!

গোঁসাই—ওকে খড়ম-পেটা করে মারবো।

সকলে—জীবহত্যা করবেন! বলেন কি?

গোঁসাই—আরে কি করি তাই বলো না?

সকলে—ওকে গঙ্গাজল খাইয়ে উপবাস করান—ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

গোঁসাই—না খেলে পাখি কি বাঁচ্‌বে?

সকলে—ওর বেঁচে লাভ?

গোঁসাই—হয় তো আবার ভাল পড়তে পারে।

সকলে—প্রায়োপবেশন করালে পাপক্ষয় হয়ে সদ্গতি নিশ্চয় হবে। ওর মুখে আর সে নাম শুনে লাভ নেই।

গোঁসাই—তবে চল সবাই মিলে শুকের গঙ্গা-যাত্রা করা যাক—যমুনার জলে আমার নয়ন জল মিলিয়ে।

শুক—একটু মোরোগের ঝোলে……

সকলে—ধর হে কীর্ত্তন ধর। [প্রস্থান

বড়কু—ছোট্‌কু আর পড়্‌বি?

ছোট্‌কু—কোন দিন নয়।

বড়্‌কু—বাঁশী কিনে বাজাতে শিখ্‌বিনে?

ছোট্‌কু—শেখা বিদ্যের তো এই দশা!

বড়্‌কু—তবে চল ঐ সঙ্গে তোর বই-সেলেটের গঙ্গা-যাত্রা ক'রে মাঠের দিকে যাত্রা করি। গরুগুলো চরাতে হবে।



সাথী

তেপান্তর মাঠ—চারদিকে ধূ ধূ করছে, তার মাঝে একটি তাল গাছ, সে একলা বাড়লো। দূরে দূরে মাঠঘেরা বন, সেখানে লতাপাতা সব গলাগলি করে আছে দেখা যায়—ঘনছায়ার মতো। মাঠের চেয়ে বড় আকাশ—সেখানে তারা সব ঘেঁসাঘেঁসি ঝিল্‌মিল্‌ করছে দেখা যায়—কেউ একা নেই। হাওয়া আসে, তার সঙ্গে আসে তার সাথী ফুলের গন্ধ। ঝড় আসে, তার সঙ্গে তার সাথী আসে আঁধি আর বৃষ্টি। মেঘ আসে, তার সঙ্গে আসে বিদ্যুল্লতা অপরূপ সুন্দরী!—সাথী

ছাড়া কেউ নেই। শরতের মেঘ—তাদের সাথী হ'য়ে চলে বলাকা—পারিজাতের হারের মতো সার বেঁধে যায় দলে দলে সাথী আর সেথো তারা।

তাল গাছ কেবলি তাদের ডাকে—পাতাগুলো নেড়ে নেড়ে; কিন্তু তাকে একলা রেখে যে যার দৌড়ে পালায় খেলতে ছোটে। তেপান্তর মাঠে একলা গাছ নিঃশ্বাস ফেলে —বৃথা আঁকুপাঁকু করে—তাদের সঙ্গে চল্‌তে চায়,—পারে না।

একদিন কোথা থেকে দুটি বাবুই পাখি সেই তাল গাছের কাছে আসা যাওয়া করতে লাগলো। পাতার উপর বসে তারা দুটিতে মিছিমিছি কত কি বকাবকি করে। তারপর একদিন মাঠের থেকে কুটোকাটা নিয়ে তাল গাছের প্রাণ যেখানে বাতাসে ঝিল্‌মিল্ করে সেইখানে চমৎকার করে তাদের সুন্দর বাসাটি বেঁধে নেয়।

তালগাছ তাদের দোলা দেয় আর মনে-মনে বলে—মিল্‌লো, সাথী মিল্‌লো!

তারপর একদিন খেলাঘর ছেড়ে ছোট ছোট পাখি তারা একে একে উড়ে যায়। সবুজ পাতার গাঁথা শূন্য বাসা নিয়ে তাল গাছ দোলা দেয় আর চুপ করে কি যেন ভাবে থেকে-থেকে!



খোকাখুকি

আদরপুরের রাজার ঘরে মানুষ হয় খোকা ; আর খুকি—সে মানুষ হয় অনাদরপুরে কাঙালের ঘরে। সে কাদের খোকা, কাদেরই বা খুকি তা তো জানতে পারছিনে, শুধু দেখতে পাচ্ছি—খোকা আছেন রাজার হালে, সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে দুধিভাতি খেয়ে ; আর খুকি—সে রয়েছে উপবাসে ছেঁড়া কাঁথায়, ভিজে মাটির উপর !

ঠাকুর পাঠিয়েছিলেন খোকাখুকি দুজনকেই এই পৃথিবীতে দুটি রূপের ফুল হয়ে ফুটে উঠতে আপনা আপনি ; কিন্তু রাজাটা ভাবলে—আদর না পেলে, যত্ন না পেলে ছেলের বাঁচা মুশকিল—ফুলকে নিয়ে সে সোনার কৌটোতে ভরে রাখলে। আর কাঙাল—সে গোড়া থেকেই ভেবে নিলে ফুল তো

শুখোবেই, কাজেই মেয়ের মরা-বাঁচার ভাবনা-ই সে ছেড়ে বসলো একেবারে গোড়া থেকে।

গামলার গাছে গোলাপফুল যেমন বাড়ে তেমনি বাড়তে থাকলো রাজপুত্তুর আর পাঁকে পড়ে পদ্ম যেমন বাড়ে, তেমনি বাড়তে থাকলো দিনে দিনে কাঙালিনী কন্যা। একেও দেখে লোকে বলে আহা, ওকেও দেখে লোকে করে আহা। কিন্তু রাজার ছেলে যখন আবদার করে তখন তার মন যোগাতে লোকে পথ পায় না—গাঁঠের কড়ি খরচ করে অকাতরে, যার গাঁঠ কাটা গেছে সে-ও ধার করে রাজপুত্তুরকে খুশী করতে চলে। আর কাঙালিনী সে মুষ্টি ভিক্ষে চেয়ে দুয়োরে দুয়োরে ঘোরে—কোন দিন পায় দুমুঠো ক্ষুদ, কোন দিন পায়ও না। যে দিন বা পায়, সে দিন চোখের জলের নুন দিয়ে সে ভিক্ষের চাল একটু একটু করে ভিজিয়ে খায়।

মড়ক আসে,—সে আদরপুরেও আসে, অনাদরপুরেও আসে! আঁচিল পাঁচিল ঘেরা সাতমহলের মাঝ থেকে এক রাতে রাজপুত্রের সাত বোনকে নিয়ে চলে যায় সব বাধা ঠেলে। কাঙালের ঘরে তার আসার কোন বাধা নেই, তবু সে আসে, কিন্তু খুঁজে পায় না কাকে নেবে। কাঙালিনী কন্যাকে কাঁদিয়ে তার পোষা এতটুকু পাখিটাকে মেরে চলে যায়।

পাখির প্রাণ আর সোনার খাঁচায় ধরা রাজকন্যাদের প্রাণ বাতাস ধরে ভাসতে ভাসতে চলে যায়—বিষ্টির মেঘের আড়াল দিয়ে, আপন জনকে ডাকতে ডাকতে, চোখ-ভেজানো বুক-ফাটানো স্বরে।

রাজপুত্র হন রাজকন্যাদের জন্যে থেকে থেকে আনমনা, অমনি তাঁকে ভোলাতে আসে নতুন নতুন খেলনা, নীলার ময়ূর,

সোনার টিয়ে, শিকলবাঁধা বাঘের ছাঁ, হাঁস, ঘোড়া কত কি! দুধ আসে, ক্ষীর আসে, মতিচুর আসে, মিহিদানা আসে—রাজপুত্র ভুলে যায়, আবার ভোলেও না! আর কাঙালের মেয়ে, তার আন্‌মনা হবার সময় নেই—সে নিয়মিত ভিক্ষে করে বেড়ায়, আর কাঁদে পাখির জন্যে! লোকে বলে—মেয়েটা মায়া-কান্না কাঁদছে, বেশী করে ভিখ্ পাবে বলে।

ঠাকুর থাকেন বসে টল-সমুদ্রের কিনারায়, পায়ের তলায় তাঁর অপার জল টল টল করে জীবননদী সমস্ত দিনরাত গড়িয়ে চলে ঠাকুরের পা ধুয়ে অকূল সাগরে মিলতে! ঠাকুরের হাতে একখানি পদ্মপাত, তারি মাঝে টল টল করে জগৎসংসার—একটি ফোঁটা জলবিন্দু! সেই পদ্মপাতায় ধরা জলবিন্দুর পাশে আর একটি ছোট ফোঁটা এসে লাগল, যেন কার চোখের জলে গড়া একটি মুক্তো! ঠাকুরের দৃষ্টি—যেমন করে শিশিরের উপর পড়ে সকালের আলো—তেমনি পড়লো এতটুকু জলের ফোঁটায়!

ওদিকে আদরপুরে সকাল থেকে রাজপুত্রের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। রাজবেশ পড়ে আছে ধুলোয়—সোনার পালঙ্ক শূন্য! লোক ছুটলো চারিদিকে, সৈন্য ছুটলো, সামন্ত ছুটলো খুঁজলো সবাই রাজ্যে-রাজ্যে—পেলে না! যদি শিকারে গিয়ে থাকেন—বনে-বনে খুঁজলে, কোথাও নেই! বিদেশে যদি গিয়ে থাকেন—দেশবিদেশ খুঁজলে, সন্ধান হয় না রাজপুত্রের। আদরে-মানুষ রাজার ছেলে, অনাদরপুরে সে যে যেতে পারে এ কথা কারো মনেই এলো না!

অনাদরপুরে গোধূলির বেলা নবীন ভিখারী একতারা বাজিয়ে চলেছে—ঘরে ঘরে ঘরে দুয়োর ভেজানো দেখে।

চলতে-চলতে এসে দাঁড়ায় ভিখারী কাঙালিনীর পাশে—গান গায় ভিখারী, ভিক্ষা দেয় কাঙালিনী—চোখের জলে ভেজা একটুখানি আদর।

ঠাকুরের হাতে পদ্মপাতায় পাশাপাশি দুটি জলের ফোঁটা এক হয়ে মেলে—শুক-তারা আর যেন সন্ধ্যা-তারা।



বাতাপি রাক্ষস

দণ্ডক অরণ্যের একদিকে অনেক মুনি ঋষির আশ্রম ছিল। আর একদিকে অনেক ক্রোশ জুড়ে অনেকখানি একটা বাতাপি নেবুর বন ছিল। সেই বনে দুটো অসুর ছিল—এক ভায়ের নাম ইল্বল আর এক ভায়ের নাম বাতাপি। ইল্বল একখানি

পাতার কুটীরে তপস্বী সেজে বসে থাকত, আর বাতাপি একটা ব্যাতাপি নেবুর গাছ হয়ে সেই ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকত।

বর্ষার শেষে সেই নেবুর বন সবুজ পাতায়, নেবুর ফুলে, বাতাপি নেবুতে ছেয়ে যেত। কত যে পাখি কত যে ভ্রমর কত যে মধুকর সেই বনে গান গাইত, ফুলে ফুলে উড়ে বসত, পাতার ফাঁকে চাক বাঁধত, তার আর ঠিকানা নাই। সেই সময় দক্ষিণ দিকে ঋষিদের আশ্রম থেকে দলে-দলে ঋষিকুমার সেই বনে বাতাপি নেবু পাড়তে আসত। তারা সারাদিন সেই নেবু বনের তলায় কচি ঘাসে শুয়ে পাখিদের গান শুনত, নেবু ফুলের মালা গাঁথত, কত খেলা খেলত, তারপর সন্ধ্যার সময় আঁচল ভরে রাশি রাশি নেবু, সুগন্ধ নেবু ফুল ঘরে নিয়ে যেত। যতদিন সেই বনে নেবু থাকত ততদিন তারা প্রতিদিন আসত, নেবু পেড়ে খেত, নেবু ফুল তুলত। অসুর ইল্বল তপস্বী সেজে বসে বসে সব দেখত, কিছু বলত না। তারপর যখন সব নেবু পাড়া হয়ে গেছে, বনে আর একটি গাছেও নেবু নেই, গাছের পাখি উড়ে গেছে, ফুলের ভ্রমর চলে গেছে, শীতের হাওয়ায় সবুজ পাতা ঝরে গেছে, শিশিরে ঘাস ভিজে গেছে, সেই সময় ভণ্ড তপস্বী ইল্বলের কুটীর-দুয়ারে মায়াবী সেই বাতাপি নেবুর গাছ সবুজ সবুজ পাতায় থোলো-থোলো ফুলে, বড় বড় নেবুতে ছেয়ে যেত। সেই গাছে কত পাখি গান গেয়ে উঠত, কত ভ্রমর গুন্‌গুন্ করে তার চারিদিকে বেড়াত। সেই সময় সেই ভণ্ড তপস্বী ইল্বল গুটি-গুটি গিয়ে আদর করে সেই ঋষিকুমারদের হাত ধরে সেই মায়া বাতাপির তলায় যেত; পাকা-পাকা বড় বড় নেবু পেড়ে তাদের খেতে দিত, তারা মনের আনন্দে তাই খেত। হায়, তারা তো জানত না এ ঋষি ভণ্ড ঋষি, এ ফল মায়াফল।

যখন সন্ধ্যা হয়ে আসত, বন আঁধার হত, বাপমায়ের কোলে ছোট ছোট সঙ্গীদের কাছে যাবার জন্য সেই ছোট ছোট ঋষি-কুমারদের প্রাণ আকুল হত তখন সেই রাক্ষস ইল্বল ডেকে বলত, আয় রে বাতাপি বাহিরে আয়। অমনি সেই ঋষি-কুমারদের পেট চিরে বাতাপি নেবুর ভিতরে থেকে মায়াবী রাক্ষস বাতাপি বাহিরে আসত। তারপর সেই দুই অসুর মনের আনন্দে সেই ঋষিকুমারদের রক্ত পান করে, তাদের সেই বনে মাটিতে পুঁতে রাখত! এক একটি ঋষিকুমার এক একটি নেবু গাছ হয়ে থাকত।

যারা সেই সব গাছের নেবু খেত, তারা যেমন মানুষ তেমনি থাকত, আর যারা সেই ভণ্ড তপস্বীর কথায় ভুলে সেই মায়া গাছের মায়া ফল খেত তাদেরি পেট চিরে রক্তপান করে সেই দুই রাক্ষস নেবু বনে নেবু গাছ করে রাখত। এমনি করে সেই বনে কত যে নেবু গাছ হল তার আর ঠিকানা নেই। শেষে তপোবনে আর একটিও ঋষিকুমার রইল না—সেই দুই রাক্ষস সবাইকে খেয়ে ফেল্লে! ইল্বল, বাতাপি দেখলে বনে আর একটিও ঋষিকুমার নাই; তখন তারা সেই ঋষিদের খাবার পরামর্শ আঁটতে লাগল; সারারাত দুজনের পাতার কুটীরে মিটমিটে আলোয় ফুস্‌ফুস্‌ পরামর্শ চোল্লো। শেষে ভোর বেলা ইল্বল যেমন তপস্বী ছিল তেমনি হল। আর বাতাপি ঘোরান শিং পাকান রোম মোটা-সোটা একটা ভেড়া হল। সেই ভেড়াকে গাছে বেঁধে ভোর বেলা ইল্বল ঋষিদের আশ্রমে চলে গেল। সেখানে গিয়ে ইল্বল ঋষিদের বল্লে, আজ আমার বাপ মায়ের শ্রাদ্ধ—আপনারা সবাই আমার আশ্রমে পায়ের ধুলো দেবেন। সে ঋষিদের মত এমনি সব কথা কইলে

যে ঋষিরা কিছুতে জানতে পারলেন না যে সে রাক্ষস। তাঁরা মনের আনন্দে তপোবনসুদ্ধ সব ঋষি সেই দুই অসুর ইল্বল বাতাপির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। ইল্বল আদর করে ঋষিদের আশ্রমে ডেকে নিলে—নেবুর বনে, সবুজ ঘাসে, কুশাসনে তাঁদের বসতে দিলে। তারপর বাতাপি রাক্ষস গাছের তলায় ভেড়া হয়ে বাঁধা ছিল তাকে কেটে যত্ন করে রেঁধে সেই ঋষিদের খেতে দিলে। নেবুবনে ঋষিকুমারেরা নেবুগাছ হয়েছিল, এদেরি তলায় বসে ঋষিরা বাতাপি অসুরের মাংস খেতে লাগলেন। তারা পাতা নেড়ে, ডাল দুলিয়ে ঋষিদের সেই মাংস খেতে কত বারণ করলে, কিন্তু ঋষিরা কিছুই বুঝতে পারলেন না; আনন্দ মনে সেই মায়া মাংস খেতে লাগলেন। তারপর খাওয়া শেষ হলে ঋষিরা চলে যান, এমন সময় ইল্বল ডাকলে—আয় রে, বাতাপি বাহিরে আয়! অমনি সেই রাক্ষস বাতাপি দয়ার সাগর সেই ঋষিদের পেট চিরে হাসতে হাসতে দেখা দিল। তারপর দুই ভায়ে সেই হাজার-হাজার ঋষির রক্ত পান করে তাঁদের নেবু বনে নেবু গাছ করে রেখে দিল। সে বনে আর একটি মানুষ রইল না।

সেই সুন্দর তপোবন কাঁটা বনে ভরে গেল। পোষা হরিণ বুনো হয়ে বনে চলে গেল; ঋষিদের কুটীরে বনের জন্তুরা বাসা বাঁধলে। দুই অসুরে ঋষিদের তপোবন একেবারে শ্মশান করে দিল। দিনে দুপুরে সে বনে আর মানুষ চলত না, যদি কেউ সে বনে যেত তবে সেই দুই রাক্ষস তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তার রক্ত পান করে সেই নেবু বনে নেবু গাছ করে রেখে দিত। ক্রমে সেই নেবুর বন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নেবুর গাছে একেবারে মহা অরণ্য হয়ে উঠলো।

নেবুর পাতায়, নেবুর কাঁটায় দিক্‌বিদিক্ ছেয়ে ফেল্লে, মানুষ চলবার পথ রইল না!

তখন সেই দুই রাক্ষস বন থেকে হাতী ঘোড়া বাঘ ভালুক ধরে ধরে খেতে আরম্ভ করলে। শেষে শীত কাল গিয়ে আবার বর্ষাকাল এল; নেবু বনের মাথা সবুজ পাতায় ভরে গেল। কচি ঘাসের উপর বড় বড় নেবু ডাল পালা নিয়ে লতিয়ে পড়ল; নেবু ফুলের গন্ধ বন আমোদ করলে। গাছের পাখি, চাকের মধুপ, ফুলের ভ্রমর আবার দেখা দিলে। গাছের পাখি গেয়ে উঠল, ভ্রমর গুঞ্জন করে উঠল, মধুপ চাক বাঁধতে লাগল; কিন্তু একটিও মানুষ, একটিও ঋষিকুমার সে বনে দেখা দিল না। পাকা নেবু ডাল থেকে খসে খসে পড়ে গেল বাতাপি নেবুতে সবুজ ঘাস ছেয়ে গেল, তবু সে বনে একটি মানুষ এল না।

মানুষের আশায় নিরাশ হয়ে সেই দুই অসুর সেই নিঝুম নেবু বনে দিন রাত্রি মেঘের কড়্মড় বৃষ্টির ঝরঝর ঝড়ের হু হু শব্দ শুনতে শুনতে যেন পাগল হয়ে উঠল। পেটের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়ল। যেদিকে চায় সেইদিকেই নেবু গাছ; গাছের পর গাছ, যত মানুষ মেরেছে, যত ছোট ছোট ছেলে খেয়েছে সবাই নেবু গাছ হয়ে নেবুর পাতায়, নেবুর কাঁটায় দিক্‌বিদিক্ ছেয়ে ফেলেছে। এই ঘোর বনে পাতা, লতা, নেবুর কাঁটা ঠেলে মানুষ কি আসতে পারে? কার এত সাহস! সেই দুই অসুর একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল। এমন সময় একদিন রাক্ষসদের যম মহামুনি অগস্ত্য তীর্থ করে সেই দণ্ডক অরণ্যে এসে দেখলেন সেখানে সে তপোবন নাই, সে ঋষিরাও নাই, সেই শান্তশিষ্ট ঋষিকুমার—তারাও নাই। পাতার কুটীর ভেঙে পড়েছে, মাটির ঘরে ফাট ধরেছে! ধানের ক্ষেত,

কুশের বন ফুলের বাগান কাঁটা গাছে ছেয়ে ফেলেছে। তপোবন যেন শ্মশান হয়েছে। এমন তপোবন কে এমন করেছে? মহামুনি অগস্ত্য সেই কাঁটার বনে ধ্যানে বসলেন; ঋষিদের কথা, ঋষিকুমারদের কথা, সেই দুই রাক্ষসের কথা, সব জানতে পারলেন। তখন মহামুনি অগস্ত্য এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হয়ে, লাঠি হাতে গুটি-গুটি ভর সন্ধ্যাবেলা সেই বাতাপি নেবুর বনে দেখা দিলেন। বনের যত গাছ ডাল দুলিয়ে পাতা নেড়ে তাঁকে ফিরে যেতে বল্লে। কাঁটা ঘেরা মোটা ডালে তাঁর পথ আগলে ধরলে। ঋষি তাদের অভয় দিলেন। তখন সেই মানুষের বন শান্ত হল, পাতা নড়া, ডাল দোলা বন্ধ হল, কাঁটা ঘেরা নেবুর ডাল পথ ছেড়ে দিলে—ঋষি চল্লেন। এতদিনে সেই বনে মানুষের গন্ধ পেয়ে সেই দুই রাক্ষসের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। বাতাপি তখন এক ভেড়া হল, আর ইল্বল তাকে গাছে বেঁধে তপস্বী সেজে অগস্ত্য মুনির কাছে গেল। তাঁকে আদর করে ঘরে এনে কুশাসনে বসতে দিলে, হাত পা ধুতে জল দিলে। তারপর যত্ন করে সেই মায়া ভেড়ার মায়া মাংস কলার পাতায় গাছের তলায় সেই ঋষিকে খেতে দিলে, ঋষি খেতে লাগলেন।

রাক্ষস যত দেয় ঋষি তত খান; খাওয়া আর শেষ হয় না। শেষ যখন সব মাংস খাওয়া হল, তখন ঋষি উঠ্‌লেন। ইল্বল ডাকলে, আয় রে, বাতাপি বাহিরে আয়! কিন্তু বাতাপি আর বাহিরে এল না। ইল্বল কত ডাকাডাকি করলে তবু এল না অগস্ত্য ঋষির পেটে আগুন জ্বলছিল, তাতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রাক্ষস ইল্বল ভাই বাতাপির শোকে পাগল হয়ে উঠল; ভয়ঙ্কর নিজ-মূর্ত্তি ধরে আকাশ পাতাল হাঁ নিয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে অগস্ত্য ঋষিকে গিলতে চল্লো। অগস্ত্য কি সামান্য ঋষি!

এক গণ্ডূষে সাগরের জল পান করেন, রাক্ষস কাছে আসতেই তাকে ভস্ম করে ফেল্লেন। রাক্ষসের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কতক ছাই হাওয়ায় উড়ে গেল, কতক ছাই জলে ধুয়ে গেল, একমুঠা রইল। সেই ছাই মুঠা নিয়ে মহর্ষি অগস্ত্য সব নেবু গাছের তলায় ছড়িয়ে দিলেন। যে সব ঋষিরা যে ঋষিকুমারেরা নেবু গাছ হয়ে ছিল তারা আবার যেমন মানুষ ছিল তেমনি মানুষ হল। আবার সেই কাঁটা ভরা তপোবন, পাতার কুটীর, মাটির ঘরে ছেয়ে গেল; ধানের ক্ষেত সোনার ধানে ভরে গেল, ফুলের বাগানে ফুল ফুটে উঠল। ঋষিকুমারেরা মনের আনন্দে সেই নেবুর বনে নেবু পেড়ে নেবু ফুলের মালা গেঁথে মনের আনন্দে খেলে বেড়াতে লাগল; আর রাক্ষসের ভয় রইল না।



রাসধারী

চর্ভটি নাটক

স্থান—ফটিক শহর।

কাল—গোধূলি।

পাত্র—রাসধারী, ভালুক, দুওরানীর ছেলে, ফটিক রাজা, মন্ত্রী, সভা-পণ্ডিত, গোপালভাঁড়, পুরিৎ, খানসামা, হুঁকোবরদার, ভৃত্য, পেয়াদা, নাগরিকগণ।

পাত্রী—রুপো, সোনা, দানা তিন কন্যা। রুপোর মা, সোনার মা, দানার মা, দিদিমা।

প্রথম দৃশ্য

[দুওরানীর আঁস্তাকুড়ের ধারে ফটিক শহরের রাস্তা, ভালুক সঙ্গে রাসধারীর প্রবেশ।]

ভালুক—রও! নাকের দড়িটা অত জোরে টানো কেন? অমন বেতালা টুনটুনি বাজালে আমি নাচি কেমন করে?

রাসধারী—নাচবার জন্যে তো তোমায় আনা হয়নি, এবার তোমায় কাম করতে হবে।

ভালুক—কাম আবার কাকে বলে? তুমি রাস ধরবে, আর আমি নাচবো, এই কথাই তো ছিল।

রাসধারী—কথা যাই থাক, শহরে যখন এসেছ তখন কাম করা চাই, না হলে পেট চলবে না।

ভালুক—তবেই তো মুশকিল—কাজ তো কিছু জানিনে, নাচতেই জানি। কি কাজ করাতে চাও বল।

রাসধারী—তা আমিও ঠিক জানিনে।

ভালুক—আচ্ছা একটা কাজের নাম কর দেখি।

রাসধারী—সুঁচের কাজ?

ভালুক—ও বাবা, সে আমি পারবো না, আঙ্গুলে ফুটবে।

রাসধারী—মুটের কাজ?

ভালুক—ইস্! আমি সবুর বাদশার উজির পুত্তুর, আমি ছোট লোক নাকি? উজিরী করা আর মন্ত্রণা দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ করা আমার দ্বারা হবে না।

রাসধারী—তা জানি মুখ চালাতে তুমি মজবুত।

ভালুক—মৌচাক ভেঙ্গে মধু যখন এনে দিই তখন বুঝি মুখ আমারি চলে?

রাসধারী—আবার তর্ক, মুখে রাস নেই?

ভালুক—রও, টেনো না। আচ্ছা সবুর বাদশার ঘরে তো সুখের অবধি ছিল না। সা'জাদা হয়ে বনে বনে ঘুরতে কেন বার হলে, এ তোমায় কেমন শখ? নিজে রাসধারী সেজে আমাকে ভালুক বানিয়ে দেশে-বিদেশে ঘুরছ কেন বল তো?

রাসধারী—ঘর ছেড়ে না পালালে কি আমি বাঁচতুম? কোন্ কালে আমাকে পিঁপড়েয় খেয়ে ফেলতো।

ভালুক—সে কেমন?

রাসধারী—সবুর বাদসার ঘরে ক্ষীরের পুতুলটি হয়ে যখন আমি জন্মালুম, তখন থেকেই রাজ্যের পিঁপড়েগুলো আমাকে এসে ঘিরলে। লোকের সামনে তারা আমার গা চুলকে দিতো, কিন্তু আড়ালে চিমটি বসাতো! তারপর আর একটু বড় হ'লে চোপদার হুকুমদার এল, তারপর আমাকে টিয়েপাখির মতো বুলি শিখাতে মৌলবী এল, মাস্টার এল, সবাই আড়ালে চিমটি দিয়ে আমার ক্ষীরে মাখা গায়ের মাংস ছিঁড়তে লাগলো। আমার গা মাসিপিসিতে ভরে গেল। সেই সময় এক জবরদস্ত হাকিম এলেন, তিনি আমাকে দেখে বল্লেন, "সর্ব্বনাশ, পিঁপড়ের কামড়, তার উপর মাসিপিসি, এরপর যদি তোমার গায়ে পিঁপড়ের পালক গজিয়ে ওঠে তবে আর রক্ষে নেই, একটি দিনও বাঁচা শক্ত।" শুনে আমার ভয় হলো—আমি সেই রাত্রেই আঁচিল পাঁচিল টপ্‌কে চম্পট।

ভালুক—পিঁপড়েগুলো তেড়ে এল না?

রাসধারী—এসেছিল বৈকি। যতক্ষণ না বাইরের বিষ্টি পেরে আমার গায়ের ক্ষীর ধুয়ে রোদে পুড়ে চামড়া শক্ত হয়ে গেল ততক্ষণ তারা আমায় জ্বালাতে ছাড়েনি।

ভালুক—বাদশার ছেলে হওয়া তো বড় বিপদ। আমি ভাবতেম তুমি কি মজাতেই আছ।

রাসধারী—পিঁপড়েগুলোকে না সরালে তক্তে না শুয়ে না বসে আরাম।

ভালুক—সেই কাজই করা যাক, চল না।

রাসধারী—তাই চল, এইখান থেকে পিঁপড়ে তাড়াতে তাড়াতে অগ্রসর হই, ওঠো—

ভালুক—ও! অত জোরে টেনো না, সবুর—

(দুওরানীর নুলো ছেলে জানালা দিয়ে)

নুলো—ও বাজিকর, একবার নাচাও না ভালুক।

রাসধারী—সন্দেশ খেতে দাও, তবে ভালুক নাচবে।

নুলো—আমরা গরীব, সন্দেশ তো ঘরে নেই।

রাসধারী—তবে পিঁপড়েও নেই তোমার ঘরে।

ভালুক—আচ্ছা চিঁড়ে-মুড়কি আনো, খেয়ে নাচবো।

নুলো—তাও নেই।

রাসধারী—ঠাণ্ডা জল আছে তো তাই দাও।

নুলো—আমার হাত দুটি যে খোঁড়া, ঘরের মধ্যে এসো, দেখিয়ে দেব কোথায় জল।

ভালুক—তোমার মা ঘরে নেই ?

নুলো—মা রাজার গোয়ালে ঘুঁটে কুড়োতে গেছে।

ভালুক—তোমার বাপ ?

নুলো—বাবা আমার তো ফটিক রাজা।

রাসধারী—আহা, তুমি বুঝি রাজার দুওরানীর ছেলে—তাই সুওরানী তোমার হাত দুটি খোঁড়া করে দিয়েছে ?

নুলো—না, বড় হয়ে পাছে আমি কাউকে রাজ্য দান করে ফেলি, সেই ভয়ে রাজার হুকুমে রাজবদ্যি জন্মাবামাত্র আমার হাতের শির কেটে দিয়েছে।

ভালুক—রাজাটাকে একবার দেখিয়ে দিতে পারো—এক থাপ্পড়ে তার মাথাটি গুঁড়িয়ে দিই।

নুলো—না, না, মা তাহলে কাঁদবে, এস না তোমরা ঘরের ভিতরে।

রাসধারী—তোমার মা এসে আমাদের তাড়িয়ে দেন যদি।

নুলো—তোমরা তো আর ছেলেধরা নও যে মা ভয় করবে।

জানো, আমি এক ছেলে কি না, মা তাই ভয় করে পাছে কেউ আমায় নিয়ে পালায়।

রাসধারী—আমরা যদি কাছে থাকি তাহলে ছেলেধরার রাজা এলেও কিছু করতে পারবে না।

ভালুক—আর তোমাকে নিয়ে করবে বা কি, তুমি তো কোনো কাজ পারবে না।

নুলো—আমার হাত থাকলে আমি কত কাজ করতুম।

রাসধারী—কি কাজ করতে শুনি?

নুলো—মাটির পুতুল গড়ে হাটে বেচতুম, চাষ করতুম, আর—

রাসধারী—আর কি করতে?

নুলো—মা কাঁদলে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতুম।

রাসধারী—ঘুড়ি ওড়াতে না?

নুলো—ঘুড়ি ওড়াতুম, শিকার করতুম।

ভালুক—তাহলে তো আমার বিপদ; নাঃ! তোমাকে হাত দেওয়া নয়।

নুলো—তোমরা আমার হাত দিতে পারো?

রাসধারী—দিতে পারি।

ভালুক—কিন্তু যার-তার উপরে হাত চালালে মুশকিল।

নুলো—যে হাত চালাতে পারবো না, সে হাতে কাজ কি হবে?

ভালুক—তাও তো ঠিক।

রাসধারী—তুমি বল্লে না রাজার ছেলে; হাত হলে তোমায় লড়াই করতে হবে, শিকারও করতে হবে।

ভালুক—তোমাকে হাত দিলে মানুষও বাঁচবে না, বনও উজাড় হবে।

নুলো—আমি যদি প্রতিজ্ঞা করি—তলোয়ার ধরব না।

ভালুক—কলম তো ধরবে ? সই করবে আর ফাঁসি হবে।

নুলো—কলমও ধরবো না।

রাসধারী—তলোয়ার কলম দুই ধরবে না তো রাজত্ব রাখবে কেমন করে ? অন্য রাজা এসে রাজ্য কেড়ে নেবে।

নুলো—নিলেই বা, আমি একতারা বাজিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াবো, নয় তো খেটে খাবো।

রাসধারী—আমি তোমার হাত দিচ্ছি ; কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর—কাউকে মারবে না, দুই হাতে দীন দুঃখীকে দান করবে ?

নুলো—আচ্ছা তাই ; কিন্তু গরীবকে কি দেবো ? সোনা রুপো এ সব তো নেই, আমাদের ঘরে এক রাশ কানা কড়ি আছে।

রাসধারী—আচ্ছা, আমরা তো গরীব, কই দাও দেখি আমাদের কানা কড়ি।

নুলো—এই নাও।

রাসধারী—যাও, তোমার হাত ঠিক হয়ে গেছে। এইবার একঘটি জল আন।

নুলো—ঘটি তো নেই, এই মাটির ভাঁড় আছে।

রাসধারী—বেশ, এই কড়িগুলো জলে ফেলে দাও, দেখ কি আছে।

নুলো—বাঃ, এ যে সব সোনার মাছ !

ভালুক—মাছ নয়, মোহর।

রাসধারী—যাও ঐ নিয়ে এখন যা খুশী খেলগে।

ভালুক—দাঁড়িয়ে ভাবছ কি ?

নুলো—মা এসে আমাকে নিশ্চয় ধমকাবে, বলবে—সোনা তুই কোথা থেকে পেলি, নিশ্চয়ই কার চুরি করেছিস।

ভালুক—কেন, সোনা কি তোমাদের হতে নেই ? কত লোক ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে থাকে, সোনায় কিন্তু তাদের মাথার ময়লা বালিশ ঠাসা—মরবার পর বেরিয়ে পড়ে।

নুলো—তারা সোনা জমায়। আমাদের তো তা হবার জো নেই, আমরা দিন আনি, দিন খাই।

রাসধারী—তোমাকে সোনা দিয়ে তো বড় ফেসাদ করলেম। আচ্ছা, তোমার হাত সেরেছে দেখে মা কি বলবেন ?

নুলো—মা খুব খুশী হবেন আর বলবেন, ঠাকুর হাত দুটি ভালো করলেন।

রাসধারী—বলবে, ঠাকুর সোনাও দিয়েছেন।

নুলো—তা কি হয় ? ঠাকুর সোনার আলো, সোনার ধান, সোনার স্বপন, সোনার বর্ণ, সোনার চাঁপা, সোনার টিয়ে, সোনার ভাই বোন সবই দিতে পারেন। সোনার মোহর এ পর্য্যন্ত কাউকে তিনি দেন নি। তোমার সোনা ফিরিয়ে নাও।

রাসধারী—ওহে উজীরপুত্র, এখন কি বুদ্ধি করি, দত্তাপহারী হ'তে হল। মনে হচ্ছে—কি একটা উপায় করা যেতে পারে, কিন্তু কি যে করি ধরতে পারছিনে।

ভালুক—জানোয়ার না বলার ঐ দোষ। মনের খটকা যায় না, বুদ্ধিও সব সময় মাথায় যোগায় না, কড়ি আর সোনার ভাবনাতেই দিন যায়। দাও তো হে ছোকরা আমার হাতে মোহরগুলো। যাঃ ফুঃ উড়ে গেল, বস্ বাগিচা সাই।

নুলো—ওই সব সোনার পাখি হয়ে উড়েছে, ওই প্রজাপতি, ওই উড়ো মাছ।

ভালুক—ধর—ধর চলো।

[প্রস্থান

(দূরে সরু মোটা নানা গলায় স্ত্রীপুরুষ)

—পালালো, পালালো—সোনা পালালো।

(নাগরিকদের দলে দলে প্রবেশ)

—জাল কই রে, নিয়ে আয় আটাকাটি, ওরে কারু ঘরে সোনা রইল না—আমার বাক্সভরা সোনা পালালো গো, আমার এক গা সোনার গহনা, আহা সব গেল গো!

মন্ত্রী—কোটাল, রাজার দপ্তরখানায় চট্ করে জাল লাগাও।

কোটাল—আমি কি জালিয়াত? ওরে সার্সিগুলো বন্ধ করে দে—পালালো, পালালো।

ভিখিরির দল—ওরে রাজবাড়ীর দিকে অনেক সোনা উড়ছে।

চোর—চল না, ধরি গে এইবেলা।

ভিখিরি—আরে রোস্ নিজের সোনাগুলো আগে সামলাই গিয়ে।

পণ্ডিত—ওহে একটা আটাকাটি চট্ করে দাও না, ব্রাহ্মণ চাইছি।

গোপালভাঁড়—ব্রাহ্মণি, আঁচল চাপা দাও।

ব্রাহ্মণী—তুমি বাক্সটায় চেপে বোসো না।

সোনার মা—সিন্দুকের চাবির ফাঁকে তুলো এঁটে এসেছো তো?

সোনার বাপ—যাঃ! ভুলে গেছি।

সোনার মা—ওমা! আমি কি পরে রুপোর মা'র ওখানে নেমন্তন্ন খেতে যাবো গো?

রুপোর মা—মেয়ের বিয়ে হবে না যে সোনা নইলে।

বাউলের দল—আমাদের সোনাও নেই, রুপোও নেই—থাকবার মধ্যে ছেঁড়া কাঁথা আর এই ভাঙ্গা তানপুরো, দিব্বি আছি।

মহাজন—ভাগ্যে আগে থাকতে সব সোনা কাগজ করে রেখেছি—না হলে আজ কি বিপদেই পড়তে হত।

দালাল—কাগজের বাজার এবার 'পারে' উঠলো বলে।

দুওরানী—ওগো আমার সোনার চাঁদকে কেউ দেখেছো?

সোনার মা—মুলো পঞ্চানন ছেলে, তার জন্যে আবার কান্না হচ্ছে! কি সোনার চাঁদের ছিরি!

সোনার বাপ—আমাদের সোনামণি মেয়েকে কি তোর সোনার চাঁদ বিয়ে করতে এসেছে যে আমাদের শুধোতে এলি?

দুওরানী—ওগো আমার বড় সাধ ছিল সোনা-বৌ ঘরে আনবো।

সোনার মা—আমরা বামুন হয়ে তোমার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবো, এত বড় কথা!

সোনার বাপ—যাই তো রাজার কাছে, আজই মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে উল্টো গাধায় চড়িয়ে দেশের বার যদি না করি আমার নাম অগ্নিশর্ম্মাই নয়!

সোনার মা—ওগো—'নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে'; কেন ছোটলোকের সঙ্গে তক্‌রার করা?

সোনার বাপ—জানো না গিন্নি, নীচ জাতের আস্পর্দ্ধা দিনকে দিন বাড়ছে। এর একটা বিহিত না করলে দেশে আর ধর্ম্ম থাকে না! ছত্রিশ জাত এক হয়ে গেলে আমাদের মান থাকবে কোথায়, আর আমরাই বা থাকি কোথায়? আজই এর ব্যবস্থা করছি। মুলো পঞ্চাননের চান সোনা-বৌ!

সোনার মা—ওগো একটু আস্তে। আজ ও দুওরানী আছে, কাল সুও হতে কতক্ষণ? তখন আমাদের সোনাকে রাজার বৌ করতে তুমিই দু'বেলা ওদের খোসামোদ করবে।

সোনার বাপ—তবে কথাটা চেপে যাওয়াই ভাল ; দাও ওকে একটু ঠাণ্ডা করে দাও।

সোনার মা—ওগো বাছা দুওরানী, তোমার ছেলেটি বাপু একটা ভালুক-নাচ-ওয়ালার সঙ্গে রাজবাড়ীর দিকে গেল দেখেছি ; এই বেলা খোঁজ করগে।

[প্রস্থান

দুওরানী—ও রে আমার সোনার চাঁদ

[প্রস্থান

রাসধারী—দেশের সোনা তো এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলে ; এখন—

ভালুক—রাজ্যের পিঁপড়ে তারা বাঁচুক, এখন রাজা কি করেন, দেখে আসি চল।

নুলো—আমার মায়ের নামে ওরা যে রাজার কাছে নালিস করতে গেল, আমি ওদিকে যাবো না।

রাসধারী—আমি যতক্ষণ রাসধারী আছি, ততক্ষণ কোন ভাবনা নেই, চলে এস।

ইতি প্রথম পালা

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কাচের বাক্সোতে তুলো জড়ানো চিনেমাটির পুতুলটির মতো শার্শিমোড়া ঘরে ফটিক রাজা লেপমুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছেন, মন্ত্রী এসে শার্শিতে টোকা দিয়ে বল্লেন—]

মন্ত্রী—মহারাজ।

রাজা—মন্ত্রী টিক্‌টিক্ করো না, ঘুমোতে দাও বলছি।

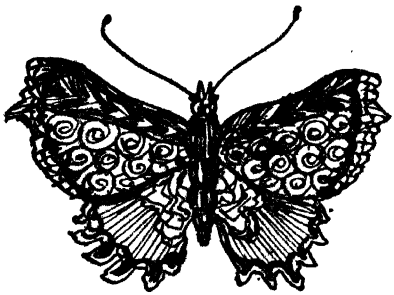
মন্ত্রী—মহারাজ। সমূহ বিপদ উপস্থিত।

রাজা—বিপদ যে উপস্থিত তা বেশ বুঝতে পারছি ; কিন্তু এই শীতে ভোর রাত্রে ঘুমন্ত লোকের কানের কাছে ঘড়ির মত টিক্‌টিক্ করে কোন লাভ নেই, সেটা তাকে বুঝিয়ে বলগে, যাও।

মন্ত্রী—মহারাজ! একবার সভায় গেলে ভাল হয়।

রাজা—তার পূর্ব্বে আমার খানসামা এক বাটি ঘন দুধের চা নিয়ে এলে ভাল হয়, আর আমার হুঁকোবরদারের সঙ্গে আলাবোলাটা এখানে এলে আরো ভালো হয় ; সব চেয়ে ভালো হয় আমাকে যদি সভায় না যেতে হয়, আমার পুরাতন ভৃত্য রাজবেশটা এইখানেই নিয়ে আসে আর সভাটাও এই ঘরেই এসে বসে, নেহাত যদি তার প্রয়োজন হয়ে থাকে। মন্ত্রি! তোমার তিনপুরুষের দেড় হাত সোনার টোপরটা আজ মাথায় চাপিয়ে আসনি যে! তোমাকে আজ ভারি ছোট দেখাচ্ছে!

মন্ত্রী—মহারাজ! সেই দুঃখুই তো জানাতে এসেছি—



দেশের সব সোনা পাখি, প্রজাপতি আর মাছ হয়ে হঠাৎ পালিয়ে গেল আর অমনি সব বড়লোক গরীব হয়ে সবদিকে খাটো হয়ে পড়ল।

রাজা—মন্ত্রি! তোমার হাতে ওটা কিসের খাতা?

মন্ত্রী—রাজভাণ্ডারের সোনার তৈজসপত্রের ফর্দ্দ।

রাজা—আমি বলি গোপালভাঁড়ের গল্পের বই! সোনাগুলো পাখি হয়ে পালালো, বড়লোকগুলো হাতে বহরে ছোট হয়ে গেল! তারপর কি হলো?

মন্ত্রী—তারপরে দেখা গেল যত সোনার অলঙ্কার, বাদশাহী মোহর জরী কিংখাব উড়ে পালিয়েছে রাজভাণ্ডার খালি করে—

রাজা—কোন্ রাজার রাজত্বে এ কাণ্ডটা ঘটলো শুনি ?

মন্ত্রী—(মাথা চুলকে) মহারাজ আমি খুব কড়া পাহারা বসিয়েছিলেম, জাল ইত্যাদি নিয়ে লোকও মজুদ রেখেছিলেম, এমন কি, আমার নিজের সোনা যায় যাক, মহারাজের লোকসান না হয় বিধিমতে তার চেষ্টা করেছিলেম ; সভা-পণ্ডিতকে ডেকে স্বর্ণধারিণীতন্ত্র খানাও আগাগোড়া পড়িয়েছিলেম, কিন্তু কিছুতেই রক্ষা হল না।

রাজা—হুঁ। গোপালভাঁড়ের ছেলে যদুর সঙ্গে তোমার সোনা মেয়েটির বিয়ের কথা চলছিলো, পাঁচশো ভরি সোনার বদলে, না ?

মন্ত্রী—আর সভা-পণ্ডিতের ছেলে বলরামের সঙ্গে গোপাল-ভাঁড়ের রুপোসী মেয়ের বিয়ের হিসেব চলছিলো—

রাজা—আর পণ্ডিতজীর কালো মেয়েটি সোনায় মুড়ে তোমার ছেলেকে দেবার কথা হয়েছিল না ?

মন্ত্রী—মহারাজ। কিন্তু সোনার এখন অভাব হল।

রাজা—বুঝেছি, ভাঁড় ও পণ্ডিতকে ডেকে আনো, আর আমার রাজবেশ, আলবোলা আর চায়ের পেয়ালা চট্ করে পাঠিয়ে দাও ; যাও।

মন্ত্রী—মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।

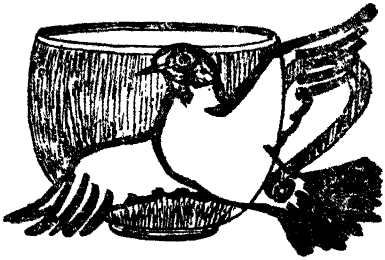
[প্রস্থান

(ভৃত্য, খানসামা, হুঁকোবরদার)

খানসামা—মহারাজ, চা—

রাজা—এ কি রে ! আমার সোনার বাটি কোথা ?

খানসামা—সেটা একটা বসন্তবাউরী পাখি হয়ে—মন্ত্রী ম'শায়ের বাড়ীর ছাদে উড়ে বসল। তারপর একেবারে উধাও।



হুঁকোবরদার—(ডাবা হুঁকো বাড়িয়ে) তামুক দিয়েছি।

রাজা— সোনার আলবোলা কই রে?

হুঁকো—সে কি আর আছে? সোনা ব্যাঙ হয়ে থপাস্ থপাস্ করে নাপাতে নাপাতে ওই পণ্ডিত মশায়ের খিড়কির পুকুরের দিকে দৌড় দিয়েছে। তাকে ধরে কার সাধ্যি।



রাজা—হুঁ বুঝলেম।

ভৃত্য— (রাজবেশ দিয়ে) কাপড় ছাড়েন।

রাজা—একি রে, এতে যে সল্‌মা-চুম্‌কির কাজ ছিল, জোব্বার খালি পালকের আস্তরটা রয়েছে যে রে?

ভৃত্য—সব সোনায় খোপ, সোনার ঘুন্টি, সোনার বুটি পেরজাপতি হয়ে ফুর ফুর করে উড়ে পালালো—ওই তোমার গোপালভাঁড়ের সবজি বাগানখানার দিকে।

রাজা—অন্যের জমিতে আমার সোনা পালিয়ে গেল। তোরা ঘুমিয়ে ছিলি, ধরে আনতে পারলিনে?

ভৃত্যগণ—দোহাই মহারাজ। আমরা হলেম ইত্তিক জাত, তাঁরা হলেন বেরাম্‌ভন্‌, তাঁদের বাড়ীর ছাঁওয়া কি আমরা মাড়াতে পারি যে গিয়ে ধরবো ?

রাজা—বটে, আচ্ছা—কোতোয়াল !

ভৃত্য—দোহাই মহারাজ আমাদের দোষ নেই।

রাজা—পেয়াদা।

হুঁকো—আমরা তিন পুরুষ মহারাজের চাকর।

খানসামা—আমার বড়দাদা হুজুরের বাবুর্চ্চিখানায় মশাল-চীর কাম করে চুল পাকিয়েছেলো, এখনো পেন্‌সন্‌ পাচ্ছে আড়াই ছিকে।

রাজা—কোই হ্যায় ? প্যাদা, এদের আদমিকো গেরেপ্‌তার করো, দেখো পালায় মৎ, পিচমোড়া করকে বাঁধো জোরসে।

(মন্ত্রী, পণ্ডিত ও ভাঁড়ের প্রবেশ)

রাজা—মন্ত্রী, এই খানসামা আমার সোনার পেয়ালা নিয়ে আবার হলপ করে বলছে যে সেটা হলদে পাখি হয়ে তোমার আটচালায় গিয়ে ঢুকেছে !

মন্ত্রী—রাজার সামনে দাঁড়িয়ে এত বড় মিছে কথাটা কোন্‌ সাহসে বল্লে মিয়া সাহেব ?

রাজা—পণ্ডিতমশায়, আমার হুঁকোবরদার বলছে যে আমার সেই সোনার আলবোলাটা বেঙ্‌ হয়ে আপনার খিড়কি পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

পণ্ডিত—এ কি একটা কথা ?—'বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং'।

রাজা—ও হে গোপালভাঁড় ? বুড়ো চাকরটা বলছে কি শোনো। আমার রাজবেশের সল্‌মা-চুম্‌কি বসানো ঘুণ্টি কটা প্রজাপতি হয়ে তোমার সবজিক্ষেতে চরতে গেছে !

ভাঁড়—হঃ হঃ মহারাজ, ও যদি বলতো আমার ওখানে গাঁজা খেতে আলবোলাটা গেছে, আর সে যদি বলতো সোনার ঘুণ্টি গেছে পণ্ডিতমশায়ের পুজোর ঘরে ঘণ্টা বাজাতে, তাহলে মিললেও মিলতে পারত; আর এ যদি বলতো চায়ের পাত্রটা গেছে পাত্রের—

রাজা—বলে ফেল, চুপ করলে যে ?

ভাঁড়—মহারাজের প্রিয়পাত্র এই প্রধান মন্ত্রী আমাকে স্নেহ করেন, কাজেই আমার ঘরে ইনি পাত্র খুঁজতে এসে-ছিলেন, আর আমি গেছি ওঁর ওখানে পাত্র দেখতে, এর বেশী কিছু জানিনে।

পণ্ডিত—(রাগিয়া) এ প্রকার মিথ্যাভাষী ভৃত্যগণকে মহারাজের উচিত হয় এখনি বিদায় করা।

মন্ত্রী—নতুন লোক বহাল করা।

রাজা—প্যাদা, এদের ডবল ডবল পেন্‌সন্ দিয়ে বিদায় কর।

ভৃত্যগণ—মরে যাবো মহারাজ, পেট চলবে না।

[প্রস্থান

ভাঁড়—আমি বলি মহারাজ এবারে একটু ভদ্রগোছের চাকর-বাকর রাখলে ভাল হয়। মাইনে একটু বেশী লাগবে আর তারা পষ্ট মিছে কথাগুলো এত অধিক বলবে না। আমি দু' এক দিনের মধ্যেই ভাল চাকর এনে দিচ্ছি।

রাজা—দু'এক দিন কি বল। চাকর ছাড়া আমার দু' এক মিনিট চলে না। আজ থেকে তুমি হলে পোশাকি চাকর। দাও আমার জোব্বাটা পরি।

ভাঁড়—এ যে বিষম হুকুম হল। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে এ কাজ করলে আমার জাত যাবে।

রাজা—প্যাদা !

ভাঁড়—নিন মহারাজ কাপড়টা পরে নিন, ঠাণ্ডা লাগছে।

রাজা—পণ্ডিত, চায়ের পেয়ালাটা আর পাঁউরুটি বিস্কুট এগিয়ে দাও তো।

পণ্ডিত—এ যবনের আহার স্পর্শ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে যে !

রাজা—প্যাদা !

পণ্ডিত—নেন, প্রভাতে উষ্ণ চা-পান বলকারক বলে শাস্ত্রে লিখেছে।

রাজা—মন্ত্রি, হুঁকোটা।

মন্ত্রী—যো হুকুম মহারাজ !

রাজা—চল এইবার রাজসভায়।

(সকলের মুখ চাওয়া-চাওয়ি)

রাজা—কই গোপাল, জোব্বাটা দাও না ?

ভাঁড়— এ কি, মহারাজের গায়ে জোব্বা যে বড় ঢিলে হল !

মন্ত্রী—তাই তো, হাত দুটো যে মাটিতে লুটিয়ে যাচ্ছে !

পণ্ডিত—পশ্চাতের দিকে রাজবেশ যে ময়ূরপুচ্ছের মতো লম্বমান রইলো দেখি ?

রাজা—একি ব্যাপার ? আমি এতো ছোট হয়ে গেলেম, এর মানে কি ?

মন্ত্রী—তাই তো, মহারাজ তো আমাদের বড়ই ছিলেন।

পণ্ডিত—এ যে বামন অবতারটি বোধ হচ্ছে !

রাজা—মন্ত্রি, শীঘ্র দর্জ্জি ডাকো, গজ এনে মেপে দেখ, আমার মনে হচ্ছে, আমি ক্রমেই ছোট হচ্ছি যাও বিলম্ব করছ কেন ?

মন্ত্রী—মহারাজ, রাজার হুড়কোতে তো হাত যায় না, মনে হচ্ছে যেন আকাশে উঠে গেছে।

সকলে—তাই তো, আমরা সবাই যে হাতে-বহরে খাটো হয়ে গেছি!

রাজা—এখন উপায় কি?

মন্ত্রী—মহারাজ আমার তো বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

পণ্ডিত—সভায় চলুন, বিচার বিতর্ক করে উপায় স্থির করা যাবে।

রাজা—এখন এ ঘর থেকে বার হই কি করে? সভা তো দূরের কথা।

মন্ত্রী—তাই তো!

পণ্ডিত—এ যে আমরা পিঞ্জরের মধ্যে শাখামৃগের মতো বদ্ধ হলেম!

রাজা—গোপালভাঁড়, তুমি কি ঠাওরালে শুনি?

ভাঁড়—দেশে সোনা নেই, তাই আমরা সবাই খাটো হয়ে গেলেম।

রাজা—ঘরগুলোও যদি খাটো হতো তো গোল থাকত না। দেখি, পাশাপাশি দাঁড়াও তো—তাই তো তোমরা তিনজনেই যে আমার চেয়ে একটু বড় রয়েছো বোধ হচ্ছে!

সকলে—না মহারাজ, এই দেখুন আমি আপনার হেঁটোর নীচে। এই দেখুন আপনার কাঁধে, এই দেখুন, পায়ের তলায়।

রাজা—হল না, দর্জ্জি ডাক, মেপে দেখা চাই।

পণ্ডিত—এদেশে তো দর্জ্জি নাই মহারাজ, যবন বলে তাদের নির্ব্বাসন দেওয়া গেছে।

রাজা—কবে নির্ব্বাসন দিলেম আমার তো মনে পড়ে না।

মন্ত্রী—আজও মহারাজের দস্তখতি হুকুমনামা দপ্তরখানায় রয়েছে।

রাজা—কই আন দেখি ?

মহারাজ, দ্বার না খুললে যাই কি প্রকারে ?

রাজা—হুকুমও আসবে না, হাকিমও আসবে না, দরজাও খুলবে না, দর্জ্জিও পাওয়া যাবে না ? এতো ভারি গোল দেখি !

(দর্জ্জিবেশে রাসধারীর প্রবেশ)

সকলে—এ কে ? তুমি কে হে ?

রাসধারী—আমি দর্জ্জি, এই গজ দেখুন।

রাজা—আরে সে কথা হচ্ছে না, ঢুকলে কেমন করে ?

রাসধারী—গজে চড়ে।

ভাঁড়—তা ভালই করেছ ; এখন মেপে দেখ তো—আমাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তবে বুঝবো দর্জ্জি।

রাজা—পণ্ডিতমশায়কে আগে মাপো, উনি সবার বড়।

পণ্ডিত—আরে রে যবনের স্পর্শ !

দর্জ্জি—মহারাজ, আর মাপতে হবে না, দেখেই বুঝছি, এঁরা তিন জনেই আপনার চেয়ে কিছু কিছু বড়।

রাজা—এর কারণ ? এতদিন তো আমিই সবার বড় ছিলেম !

দর্জ্জি—আপনার ঘরে আর একটুও সোনা নেই আর এঁদের ঘরে এখনও যে সোনামুখী মেয়ে তিনটি রয়েছে।

রাজা—ওস্তাগর সাহেব, মেপে দেখো তো, আমি ছোট হয়েছি না আমার কাপড় বড় হয়েছে ; আমি ঠিক পাচ্ছিনে।

দর্জ্জি—ওস্তাগরের হাতের কাজ সে তো খাটো হয় না, চিরকাল সমানই থাকে। মহারাজ নিজেকেই নিজে বোধ হয় ছোট করে ফেলেছেন।

রাজা—তা হতে পারে, কিন্তু এখন উপায় ?

দর্জ্জি—এক হদিস আছে, কিন্তু বকশিশ না পেলে বলতে পারিনে।

রাজা—সাহেব, যা চাও দেবো, আমাকে মাপসই করে দাও।

দর্জ্জি—আমি সোনা চাই; মহারাজ কি তা দিতে পারবেন ?

রাজা—কি বলো তুমি ?

মন্ত্রী—আজ্ঞে মহারাজ, সোনা তো দেশে আর নেই।

রাজা—কেন ?

মন্ত্রী—সব যে উড়ে পালিয়েছে।

রাজা—এখনো তামাসা করছো মন্ত্রী ? আমার এই বিপদ।

ভাঁড়—তামাসা এতকাল এই গোপালভাঁড়ই করে এসেছেন, কিন্তু এবারে সব ভাঁড় ফুটো করে তামাসা যে লোকটা করছে, সে বড় সোজা লোক নয়।

পণ্ডিত—সেই নাটের গুরুকে একবার পেলে হয়, খড়ম-পেটা করে ছাড়ি!

দর্জ্জি—পণ্ডিত মশায়ের খড়ম জোড়া ক'গজ মেপে দেখবো।

পণ্ডিত—আরে ওটা পরে আমায় পুজোয় যেতে হয় মহারাজ।

রাজা—বাজে কথা রাখ; আমার ঘরে সোনা নেই; তোমাদের ঘরে তো আছে ? এই ওস্তাগর সাহেবকে দিয়ে আমায় বড় করে দাও।

সকলে—এ তো বিষম বিপদ হল! সোনা কোথা পাই ?

রাজা—আমারো বিপদ কি কম নাকি ?

পণ্ডিত—রাজবাড়ীতে ইস্তনাগাদ আমি চাল-কলাই বেঁধে এসেছি।

রাজা—সেই জন্যে তোমার উপর আমার সন্দেহ বরাবরই আছে যে স্বর্ণধারণী মন্তর জপ করছো আর সোনা উড়িয়ে নিচ্ছ। মন্ত্রী, ভাঁড় তোমরাও শোনো, সোনা না হলে যখন আমি মাপসই হতে পারছিনে, তখন তোমাদের উচিত হয়, পুরোনো চাকর হয়ে এই বিপদের সময় দর্জ্জিকে সোনা দান করে তোমাদের মনিব আমাকে উদ্ধার করা।

দর্জ্জি—ওনাদের ঘরে যে সোনামুখী মেয়ে তিনটি আছে সে কটিকে দিলেই আমি খুশি আছি।

রাজা—শুনলে সবাই ? আর বিলম্ব করো না।

পণ্ডিত—যবনকে কন্যাদান প্রাণ থাকতে পারবো না।

সকলে—নাঃ প্রাণ থাকতে নয়।

রাজা—তাহলে এদের প্রাণ গেলেই শুভ কাজটা করা কি বল ওস্তাগর সাহেব ?

দর্জ্জি—সেইটেই বোধ হচ্ছে সহজ উপায়।

রাজা—কে আছিস্ জল্লাদকে ডাক।

দর্জ্জি—আসুন মহারাজ, আপনাকে মাপসই করে দিই। (কাঁচি চালিয়ে) এই এক পোঁছ, দুই পোঁছ, তিন পোঁছ, বস্ ফিট্‌ফাট্ গড়ের মাঠ ! দেখুন মহারাজ আয়নাতে—এইবার বকশিশ হুকুম করুন।

রাজা—এই এক পাই, এই দু পাই, এই তিন পাই।

দর্জ্জি—সোনা কই ?

রাজা—যে উড়িয়ে দিয়েছে, সেই জানে ; আমি কি জানি ?

ভাঁড়—তুমি কোন্ দিশি দর্জ্জি হে ? রাজার সঙ্গে তক্‌রার কর !

মন্ত্রী—রাজা মশায় তো তিন পাই দিয়েছেন ; আমি হলে আধ পয়সা দিতুম না।

পণ্ডিত—বড়ই তো আস্পর্দ্ধা তোমার হে !

রাজা—কই রে,—জল্লাদ গেল কোথা ? চট্ করে এই দর্জ্জিকে সোনা যেখানে পালিয়েছে, সেইখানে পাঠিয়ে দিক না !

(ভালুকের প্রবেশ)

সকলে—ওরে বাস রে !

রাজা—আপনি কি মনে করে ?

ভালুক—মহারাজ জল্লাদকে ডেকেছেন।

রাজা—সে গেল কোথায় ? আসতে দেরী করছে কেন ?

ভালুক—সে এই পেটের মধ্যেই আছে !

রাজা—এঁ্যা ! ওহে মন্ত্রী, ও ভাঁড়, পণ্ডিত মশায়, প্যাদা—,

ভালুক—পেয়াদাটাও জল্লাদকে খুঁজে আমার পেট হাতড়াচ্ছে। হেউ ! এখন মহারাজ, কি হুকুম হয় ?

রাজা—রোসো মনে করি ; কি কথা হচ্ছিলো ভালো, বল না হে মন্ত্রী !

মন্ত্রী—আজ্ঞে মহারাজ ! পণ্ডিত বল না হে।

পণ্ডিত—আমার তো মতিভ্রম হয়েছে দেখে শুনে।

ভাঁড়—একে ভালুক, তায় কথা কইলে। ভাঁড়ে সোনা যা ছিল তা তো গেছে, এবারে বুদ্ধিটুকুও যায় বুঝি !

রাজা—ওহো ! মনে পড়েছে। সোনা নিয়ে কথা হচ্ছিল না ?

পণ্ডিত—মনে পড়েছে। মহারাজ আমার ব্রাহ্মণীকে আজ কিছু স্বর্ণ দান করতে মন্ত্রীকে হুকুম করছিলেন।

রাজা—কাকে কি দান করব বলে খাজাঞ্চিকে ডাকছিলেম বটে, কিন্তু।

মন্ত্রী—আমার মনে হচ্ছে মহারাজ যেন জমিদারী তদারক করতে যাবার জন্যে তিনশো মোহর আমাকে দিতে হুকুম দিচ্ছিলেন।

ভাঁড়—আর আমার বেশ মনে হচ্ছে, মহারাজার হুকুম পেয়ে আমার জন্যে এক ভাঁড় সোনা আনতে খাজাঞ্চি দৌড়লেন আর এই ভদ্রলোকটি উপস্থিত হলেন।

দর্জ্জি—আমার বেশ মনে আছে, মহারাজ আমাকে তিন কন্যা দেবেন বলে শেষে তিন পাই দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

ভালুক—আমারো কানে গেছে—

রাজা—না না, সে কথাই নয়; আমি জল্লাদকে ডাকছিলেম এই দর্জ্জির সঙ্গে তিন কন্যার বিয়ের বন্দোবস্ত করে দিতে।

ভালুক—জল্লাদ আসবে না, এখন আর কাউকে পাঠান কন্যার চেষ্টায়।

রাজা—জল্লাদ পেয়াদা দুজনেই ভাগলে! এক আছেন এ কাজের উপযুক্ত পুরিৎ; তাঁকেই ডাকি, কোই হ্যায়?

(ঘণ্টা বাজিয়ে পুরিতের প্রবেশ)

রাজা—ঘণ্টা নাড়া রাখো; যাও, পাত্রের কন্যা, ভাঁড়ের কন্যা আর কার কন্যা আছে?—

পুরিৎ—পণ্ডিত মশায়ের কন্যা।

রাজা—তাই যাও—তিন কন্যে আন চট্‌পট্‌।

পণ্ডিত—এ যে জাতও যায়, পেটও ভরে না দেখি!

মন্ত্রী—পেট যে ভরাবার, সে ভরিয়ে এসেছে—

ভাঁড়—ভাঁড় পর্য্যন্ত চেঁচে পুঁছে খেয়ে না যায়!

ভালুক—তিন কন্যে তো আসছে, এইবার বরকে ডাক দেওয়া যাক।

রাজা—একটু বাইরে গিয়ে ডাকলে ভাল হয়। রোসো, বর আসবার আগে, দেনা পাওনা কেমন হবে তার একটা হিসেব হোক। আমি তো তিন কন্যে হাজির করে দিলেম; এখন আমায় কি দেবে, সেটা বলো—

দর্জ্জি—যত সোনা উড়ে পালিয়েছে, সব আবার যেখানকার সেখানে ফিরে আসবে।

রাজা—তাতে আমার কি লাভ হলো?

ভালুক—সোনার আলবোলা, সোনার পেয়ালা, সোনার সাজগোজ—

রাজা—সে তো যা ছিল তাই ফিরে পাওয়া গেল, লাভটা দাঁড়ালো কোথায়?

দর্জ্জি—দেশের সোনা ফিরে এলে প্রজারা আপনাকে আশীর্ব্বাদ করবে।

রাজা—আশীর্ব্বাদের সঙ্গে একটুও সোনা তারা দেবে বলতে পারো?

দর্জ্জি—প্রজার আশীর্ব্বাদই তো রাজার পরম লাভ।

রাজা—দেখছি বিষয়বুদ্ধি তোমার মোটেই নেই, এঁদের শুধোও দেখি, কি বলেন?

মন্ত্রী—প্রজার ঘরে যত কম সোনা থাকে, রাজার ততই লাভ—এ তো জানা কথা।

পণ্ডিত—রাজার ঘরে যত সোনা, রাজ পণ্ডিতের দক্ষিণা ততই বেশী হয়ে থাকে।

ভাঁড়—আর রাজ পারিষদ ভাঁড় ততই ভর্ত্তি হয়।

রাজা—শুনলে তো ?

দর্জ্জি—প্রজারা কি বলে শুনলে হয় !

রাজা—তাই তো, প্রজাদের মতটা আনে কে ? পেয়াদা তো নেই। ওই যে কে আসছে !

(কাগজের টুপি মাথায় ভেঁপু বাজিয়ে খবরের কাগজ উপস্থিত)

রাজা—তুমি কে হে ?

কাগজ—আমি প্রজাদের মুখনল ও মুখপত্র, দেশের মুখ্যপাত্র ও দশের কৃপাপাত্র। প্রজারা বলছে—রাজার সোনা বাড়লে আমাদেরও খাজনা বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে, এতে আমরা খুব খুশি।

দর্জ্জি—তোমার মাথার ওই টুপিটা কে বানিয়ে দিলে ?

কাগজ—টুপি কি, এটা আমার মটুক। আমার আশী বচ্ছরের ভীমরতির পুরস্কার, দশে মিলে উপহার দিয়েছে।

রাজা—আর কিছু দেয়নি ?

কাগজ—দিয়েছে দড়ির চারপাই।

ভালুক—চারপাই তো হয়েছে, এখন চারপায়ে লম্বা হওগে।

রাজা—উনি লম্বা হলেন চার পায়ে, তোমরা তিন কন্যে নিয়ে লম্বা হবে সাত পায়ে আর আমি বসে কড়ি গুনবো বুঝি ? তা হচ্ছে না। সোনা মেয়ে তোমরা নাও, তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু ঐ তিন মেয়ের বাপের ঘরে যত সোনা, সব আমায় দিয়ে যাবার ব্যবস্থা না করলে কন্যা দান করা হচ্ছে না।

ভালুক—সব ঠিক হয়ে যায়, যদি যে বরটি আসবে, তাকে মহারাজ নিজের ঘরের লোক বলে স্বীকার করেন।

পণ্ডিত—তা কেমন করে হবে ? এই দর্জ্জির সঙ্গে যখন তার সম্পর্ক রয়েছে, তখন তাকে নিলে যে মহারাজের জাত যাবে।

রাজা—রাজার আবার জাত কিসের ?

পণ্ডিত—তা বটে ; তা হলে মহারাজ ছেলেটিকে গোত্র বদলে পোষ্যপুত্র নিয়ে ফেলুন, আমি মন্ত্র পড়াতে রাজি আছি।

রাজা—তবে তাই হবে, কি বল ওস্তাগর সাহেব ?

দর্জ্জি—ছেলের মা যদি রাজি হয় তবে তো—

মন্ত্রী—রাজি হতেই হবে ; রাজ-আজ্ঞা—

পণ্ডিত—ব্রাহ্মণের আজ্ঞা—

রাজা—আমার আজ্ঞা—

সকলে—আমার আজ্ঞা, রাজ-আজ্ঞা—

ভালুক—আমার গাঁগ্‌গা, দুওরানী না বল্লে কিছুই হবে না।

রাজা—দুওরানী ! সে আবার কে ?

ভালুক—বরের মা, আপনার দুওরানী।

রাজা—আমার দুওরানী নাকি ? তবে তো গোল চুকেই গেছে।

পণ্ডিত—দুওরানীকে সুয়োরানী করে নিলেই তো সব দিক বজায় থাকে।

সকলে—আমাদেরও জাত্ রক্ষে হয়।

রাজা—আমারো সিন্দুক ভরে।

দর্জ্জি—কিন্তু প্রজাদের পেট যে খালি থাকবে ?

কাগজ—এই বল তো !

(বরবেশে দুওরানীর ছেলেকে লইয়া প্রবেশ)

রাজা—ও আমার সোনার কৌটো এসো সুওরানী এসো।

সকলে—আহা আমাদের সোনার চাঁদ রাজকুমার—

রাজা—পুরিৎ মেয়ে তিনটেকে আনতে এত দেরী করছে কেন ?

মন্ত্রী—গিন্নীর সব কাজেই দেরী, তাই না হয় মেয়েটাকে চট্‌পট্ পাঠিয়ে দাও।

পণ্ডিত—ব্রাহ্মণী বোধ হয় পাঁজি খুলে বসেছেন। আরে মেয়ে রাজার বৌ হবে, এতে কি আর দিনক্ষেণ দেখে ?

ভাঁড়—তাই তো বড় দেরী হল যে, দাঁও ফসকে যাবে দেখছি ! ওই যে তারা আসছে।

(তিন কন্যার চোখ মুছতে মুছতে প্রবেশ)

কন্যারা—আমরা এত শিগ্‌গির শ্বশুর বাড়ী যাবো না।

মায়েরা—এমন দস্যি মেয়ে দেখিনি, চুপ কর।

কন্যারা—আমরা বড় হয়ে বিয়ে করবো।

মায়েরা—কোথাকার রাক্ষুসী মেয়ে জন্মেছে। রাজার বৌ হবি, তা নয় বড় হয়ে বিয়ে করবো !

দিদিমা—বিয়ে করবো না বল্লেই হলো। ডাক না পুরিৎ, একটু হলুদ ছুঁইয়ে মন্তর পড়ে দিক, কেমন না বিয়ে হয় দেখি !

ভালুক—দিদিমা, আগে আমার কপালে হলুদ দাও। এর মধ্যে কারু বিয়ের বয়েস হয়ে থাকে তো তোমার আর আমার।

রাজা—মন্দ নয়, ঘটকালিটা! আমার পাওনা ভুলো না। ওই ঘণ্টা বাজিয়ে পুরিৎ আসছে।

কুমার—আমি বিয়ে করব না, বি-এ পাস করে বিলেত যাবো।

রাজা—বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করবে নাকি? সে হবে না।

কুমার—আমি বি-এ পাস করে তবে বিয়ে—

রাজা—তার আগে আমি যদি মরি, তবে তো সোনা আর আমার অদৃষ্টে ঘটে না; তা হবে না—বিয়ে এখনি করতে হবে রাজ-আজ্ঞা।

পণ্ডিত—পিতৃ-আজ্ঞা।

সকলে—আমাদেরও আজ্ঞা।

ভালুক—আমার গাঁগ্‌গা বিয়ে হবে না—এখন

দিদিমা—ওলো পালাই চল, শেষে…

রাজা—একটা বিয়ে দেবোই আমি, পালাও কোথায় পুরিং—

দিদিমা—ধরলে রে ধরলে রে [পলায়ন

সকলে—ধর, ধর—পুরিং [প্রস্থান

রাজা—একি সব ফাঁক। মন্ত্রী কোথায়? ও পণ্ডিত মশায়! ও হে ভাঁড়! জল্লাদ, পেয়াদা, আমার তিন তিন চাকর—

(সোনার বাটি, সোনার আলবোলা, জরীর পোশাক, সোনার সাজ, সোনার সটকা, সোনার বাটি হাতে তিন তিন চাকরের প্রবেশ।)

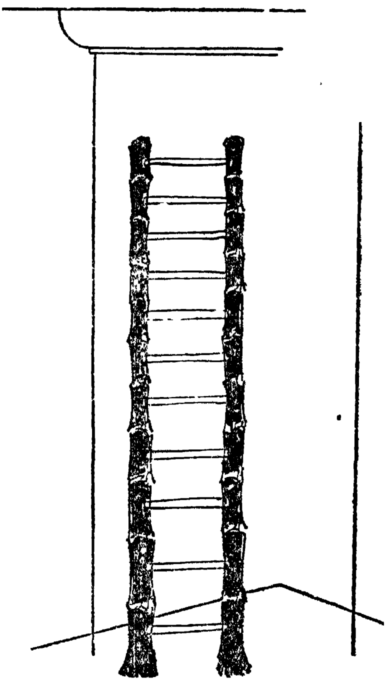
ভৃত্যগণ—এই যে মহারাজ, আমরা হাজির।

রাজা—সুওরানী, কুমারকে নিয়ে অন্দরে যাও।

দর্জ্জি—আমিও তবে আসি মহারাজ।

রাজা—আপাততঃ যেতে পারো—আমি একটু আরাম করবো।

ইতি পালা সাঙ্গ



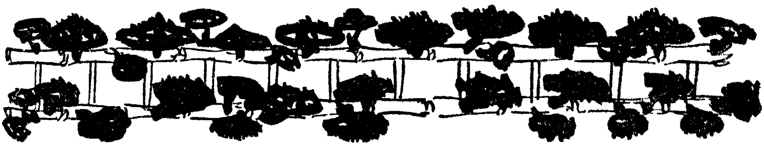
আমাদের গল্প

বাঁশের মই, তার ঘাড়ে পা রেখে সবাই উঠে যায়—উপরে খুব উঁচুতে—কেউ উঠে যায় মই বেয়ে স্বর্গে, কেউ যায় নেমে মই বেয়ে পাতালে—এই চলেছিল সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগ ধরে।

অরূপ-সুন্দরী কন্যা—তাকে চুরি করে নিতে দৈত্যপুরী থেকে রাজপুত্র চলে গেল মই বেয়ে গগনস্পর্শী কেল্লার বুরুজ-ঘরে। চিলে-ঘরের ছাতের কানাচে পাখির বাসা, পাঠশালার ছেলে সে-ও সেখানে উঠে গেল মই বেয়ে অধরা-পাখির বাচ্চা ধরতে! মেঘ-ছোঁওয়া গাছের ফল-ফুল পাড়তে উঠে গেলো—বাঁশের মই বেয়ে মেয়েরা-ছেলেরা সবাই! চিলও হার মানে যাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে

এমন দুর্জ্জয় পাহাড়ের পাঁচীল তাকেও টপ্‌কে গেল বাচ্চা সিঁন্দবাদ আর চোর চক্রবর্ত্তীর দল—মই বেয়ে! মই বেচারা সে আড় হয়ে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়েই থাকলো—উঠতে পেলে না কোনদিন আপনাকে ছাড়িয়ে একটুখানিও উপরে!

যে মাটিতে মই দাঁড়িয়ে থাকে সত্য ত্রেতা দ্বাপর—সেই মাটি কলির আরম্ভে হঠাৎ একটা ভূমিকম্পে তলা থেকে একটা বিষম ধাক্কা দিয়ে মইখানাকে আধ আঙুল উপরে তুলে দিয়ে মজা করলে; মই সেই সময় চকিতের মতো নিজের মাথার উপরে না-দেখা যা-কিছু তাই দেখে নিয়ে কাত হয়ে পড়লো মাটিতে—উঁচু থেকে নীচে পড়ার ধাক্কায় চূরমার হয়ে গেল সে সেদিন ঘন বর্ষার শেষ রাতে! তিন কেলে বুড়ো পাকা বাঁশের মই জলে না ভেজে



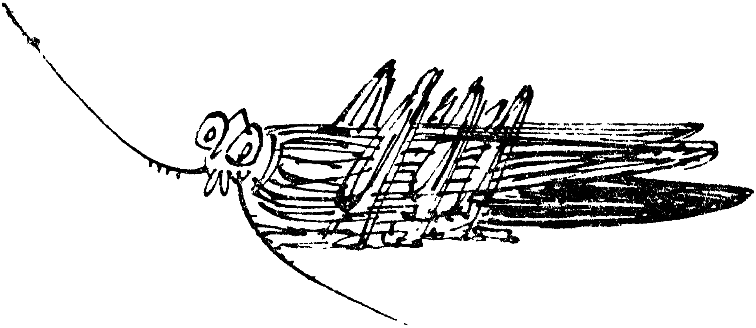


সেই জন্যে বেঙরাজা হুকুম দিলেন, ওকে ছাতা দিয়ে মুড়ে রাখতে। সেদিন থেকে আপনার কাজ বন্ধ করে পড়ে রইলো মই আকাশের দিকে ছেয়ে!

পাখি উড়ে চলে উপর থেকে উপরে। ছাগলছানা লাফিয়ে

ওঠে পাহাড়ের চূড়োয়। আটাকাটি দিয়ে ধরে পাখি ছেলেরা, বাঁশের আঁকশি দিয়ে উঁচু ডালের ফুল পেড়ে নেয় মেয়েরা, উড়ো কলের পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে চলে যায় রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালের পুত্র, কত পুত্র-মিত্র তার ঠিক-ঠিকানা নেই—আজব-দেশের দিকে মেঘ ছাড়িয়ে, সাত সমুদ্র পেরিয়ে! মইখানা এই সব কাণ্ড-কারখানা দেখে আর দুঃখ পায়। বাঁশের ছিপ দিয়ে যখন টেনে তোলে অতল জলের তলা থেকে মৎস্য-কন্যাকে মেছুয়ার দল—মই দেখে আর দুঃখু পায় আর মনে মনে বলে—আর কি আমার কাজ আছে বেঁচে থেকে?

এমনি দুঃখের ঘুণ বাঁশের মইকে ভিতরে ভিতরে ফোঁপরা করে যখন দেয় তবে সে দেখতে পায় সুখদুঃখের উপরের বাসায় ধরা আছে যত কিছু অধরা অজানা না-দেখা তাদের।



গঙ্গাফড়িং

একে জায়গাটা আদিগঙ্গার পশ্চিমকূলে, তার উপরে একটা রামতুলসীতলাও পাওয়া গেল। গঙ্গাফড়িং মহা আনন্দে সেইখেনে আখড়া বসিয়ে দেশের ফড়িংদের নিয়ে অষ্টপ্রহর সঙ্কীর্ত্তন জুড়ে দিলেন। তুলসীপাতা খেয়ে খেয়ে গঙ্গাফড়িং ক্রমে নবদুর্ব্বাদল-শ্যাম বর্ণটি হয়ে উঠুন, ফড়িংগুলো কাদাগোলা গঙ্গাজল খেয়ে গঙ্গামৃত্তিকার অলকা-তিলকার ছাপমারা হয়ে থাকুন, এদিকে গঙ্গার ওপারে খুদে পিঁপড়ে ডেঁয়ে পিঁপড়ে তারা মাঠের মধ্যে গড়-গোষ্ট হাট-বাজার ঘর-কন্না পেতে বসবার যোগাড়ে সকাল থেকে সন্ধ্যে খুদ কুঁড়ো সংগ্রহ কোরে কেবলি খাটছে। বাস্‌রে সে কি খাটুনি রোদে পুড়ে ডেঁয়োগুলি কালো হয়ে গেল, রাঙামাটি খুঁড়তে খুঁড়তে খুদে পিঁপড়েগুলোর গায়ের বর্ণ পোড়ামাটির মতো রং ধরলে।

এইভাবে দিন যায়। গঙ্গাফড়িংয়ের 'গঙ্গা গঙ্গা' বলে হুল্লোড় করে দিন যায় আর পিঁপড়ের দিন যায় 'কাজ কাজ', কেবলি কাজ করে। ক্রমে বর্ষা গেল, শরৎ গেল, শীত কাটলে

শেষে বসন্তকালটাও ফুরালো। খরার দিনে আদিগঙ্গার জল ম'রে তলার মাটি পর্য্যন্ত ফেটে চটে শুকিয়ে উঠলো—মাঠগুলোয় আর ঘাসও গজায় না, গাছও বাঁচে না, কেবলি ধুলো ওড়ে আর আকাশের শেষ পর্য্যন্ত আদিগঙ্গার দুইপার ধূ ধূ করতে থাকে।

পিঁপড়েরা মাটির তলায় ঢুকেছে। সেখানে তাত একটুও নেই, জমা করা খাবারও যথেষ্ট,—পিঁপড়েরা আরামেই রইলো। আর গঙ্গাফড়িং শুকনো রামতুলসীর তলায় না পান হাওয়া, না পান খাওয়া—তাই একদিন ওপার থেকে এপার ভিখ্ মাঙতে চল্লেন। পিঁপড়ের খুদে শহরে খুদ কুঁড়োর গুলজার বাজার বসেছে—পিঁপড়েরা আসছে, যাচ্ছে, নিচ্ছে, থুচ্ছে—গঙ্গাফড়িংকে দেখেও তারা দেখে না। বেলা বাড়লো, খিদেয় তার পেট জ্বল্লো, তেষ্টায় গলা কাঠ হল। এক মুদির দোকানের সামনে—'ভিক্ষে দাও বাবা' বলে ফড়িং গিয়ে হাত পাতলেন।

মুদির দোকানের খুদে পিঁপড়ে কট্ কট্ করে শুনিয়ে দিলে—'ভিখ্ পাওয়া যাবে না।'

গঙ্গাফড়িং ধারে খাবার চাইলেন—'এখন কর্জ্জ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও—ফসল ফল্লে কুঁড়োর বদলে কাঁড়ি দিয়ে ধার শুধবো।'

পিঁপড়ে শুধালো,—'খুদ কুঁড়ো কাঁড়ি না করে এ ক'মাস করছো কি শুনি?'

গঙ্গাফড়িং খঞ্জনী বাজিয়ে গঙ্গামাহাত্ম্য সুরু করে দিলেন। রাত্রি হয়ে এল, মুদি বল্লে,—'যদি গেয়ে গেয়েই দিনটা গেল তবে না খেয়ে রাতও পোহাক।' বলে সে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করলে।



হিন্দবাদের প্রথম সিন্দবাদের শেষ যাত্রা

সিন্দবাদ ছিল এক রকমের মানুষ আর হিন্দবাদ ছিল ঠিক তার উল্টো ধরনের লোক। সিন্দবাদ বারে বারে যায় সাত-সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে—রত্নগিরি, সলাবত দ্বীপ, বালাশোর বন্দর, কাফ্রিস্তান, নারকেল-নগর, চন্দন-দ্বীপ, কুমারিকা অন্তরীপ, সরন্দিপ এমনি কত দেশ বিদেশে বাণিজ্যপোত ভেড়াতে ভেড়াতে, কোথাও আর বাকি নেই। আর হিন্দবাদ থাকে বোগদাদে বসে আর গল্প শোনে সিন্দবাদের কাছে; রক পাখির গল্প, মহারাজের ঘোড়ার কথা, লোমশ মানুষের ইতিহাস, অজগর সাপের কাহিনী, বিষ-লতার, গোলমরিচের ক্ষেতের, আরবি পাশার, জিন-লাগাম-শূন্য ঘোড়-সওয়ারের, কবরী কন্যার, ভীষণ বুড়োর, মুক্তোর ক্ষেতের, বোম্বেটে-জাহাজের, হাতী শিকারের নানা অদ্ভুত অদ্ভুত খোস গল্প—উল্টে পাল্টে কতবার তার ঠিক নেই; আর এক এক গল্প শোনার পরে একশো করে সোনার মোহর সিন্দবাদের কাছে দাবী করে।

সিন্দবাদ এক একবার বাণিজ্য যাত্রা করতো, আর হিন্দবাদ গালে হাত দিয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে ভাবত—যদি সিন্দবাদের জাহাজ হঠাৎ কোনো দ্বীপে চিরকালে মত আটকে যায়, কিম্বা সিন্দবাদ ফিরেই না আসে, কোন দেশের কোন রাজকন্যাকে বিয়ে করে সেই দেশেই সংসার পেতে বসে, তা হলে উপায় কি হবে? কিন্তু সিন্দবাদের জাহাজ ডোবে, চড়ায় আটকায়, সিন্দবাদও ধরা পড়ে যায় কখনো কখনো কিছু দিনের জন্যে, আবার কিন্তু ফিরে আসে সিন্দবাদ—নতুন বাণিজ্যপোতে জাহাজ বোঝাই গল্প আর মাল-মত্তা মাঝি-মাল্লা নিয়ে।

সিন্দবাদ প্রতিবারেই ফিরে আসে আর বলে—এই শেষ, আর যাবো না। কিন্তু প্রতিবারেই সমুদ্রের নীল জল আকাশের মতো ঘন নীল হয়ে ওঠে বছরের শেষে, আর সিন্দবাদ জাহাজ সাজিয়ে হিন্দবাদের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাণিজ্যে আর গল্প সংগ্রহে। ক্রমে সিন্দবাদের ফিরে আসা আর যাওয়ার শেষ নেই—এই বিশ্বাসই হিন্দবাদের মনে খুব শক্ত হয়ে বসে গেল। সেই সময় একদিন হঠাৎ সিন্দবাদ চুপি চুপি কাউকে কিছু না জানিয়ে একটা ভাঙ্গা জাহাজে একেবারে গল্পের দেশের শেষ দেখতে বেরিয়ে পড়েছে, হিন্দবাদ এর কিছুই জানে না; সে বছরের শেষে গল্প শুনতে সিন্দবাদের দরজায় এসে মোটের ঝুড়িটা নামিয়ে বসলো।

তখনো রাত ফরসা হয়নি, বোগদাদের রাস্তার পাথরগুলো হিমে ঠাণ্ডা হয়ে আছে, দোকান পাট সমস্ত বন্ধ, সরু গলির শেষটাতে নীল সমুদ্রের মতো একটা অন্ধকার, আর কিছু নেই —সাড়া নেই, শব্দ নেই, আলো নেই। হিন্দবাদ সিন্দবাদের দরজায় হিম পাথরের চাতালে ঝুড়ির উপরে মাথা রেখে শুয়ে

সকালের অপেক্ষায় রয়েছে—কিন্তু সকাল আর আসছে না, সিন্দবাদও দেখা দিচ্ছে না, রাতের বাতাস কেমন যেন ঠাণ্ডা বইছে।

হিন্দবাদ ছেঁড়া কাঁথাটায় সর্ব্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে গলির মোড়ের দিকে চেয়ে সেই একটুকরো নীলের গায়ে একটা জাহাজের মাস্তুল কখন দেখা দেয় তারি অপেক্ষায় চেয়ে আছে। দূরে একটা যেন জাহাজের আসার ছপ্ ছপ্ শব্দ পাচ্ছে হিন্দবাদ মনের মধ্যে। কবরী কন্যা কেবলি আজ যাতায়াত করছে। প্রকাণ্ড একটা কবর—তার ধারে এক চমৎকার সুন্দরী—কালো চুলে তার ফুলের মালা, ঠোঁটে হাসি লেগে রয়েছে, হাতের আঙ্গুল হেনার রঙে হিঙুল বর্ণ। সেই সুন্দরী কন্যে হাতছানি দিয়ে হিন্দবাদকে ডাকতেই সে তার সঙ্গে চলে গেল গলি পেরিয়ে, বোগদাদ ছাড়িয়ে কতদূর কে জানে?

হঠাৎ কন্যা বলে উঠল—এই ঘুমের দেশ, ঐ যে সিন্দবাদ।

হিন্দবাদ চেয়ে দেখবার চেষ্টা করলে কিন্তু ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে গেছে, আর খুল্লো না।—সেলাম আহেকম্ বলে হিন্দবাদ একবার হাতটা কপাল ছোঁয়াতে চেষ্টা করলে, হাত উঠলো না।